উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা পর্যায়

তৃতীয় সেমেস্টার

কোর পত্র (আবশ্যিক) ৩০২

প্রবন্ধ সাহিত্য

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় –ক

একক ১ - বিবিধ প্রবন্ধ- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – ভূমিকা।

একক ২ – প্রবন্ধ –উত্তরচরিত ।

একক ৩ - বিদ্যাপতি ও জয়দেব এবং শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেসদিমোনা ।

একক ৪ – গীতিকাব্য ।

একক ৫ - বঙ্গাদেশের কৃষক ।

একক ৬ – দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা।

একক ৭ - আত্মচরিত - শিবনাথ শাস্ত্রী।

পর্যায় –খ

একক ৮ – সাহিত্যচর্চাঃ বুদ্ধদেব বসু – সাধারন আলোচনা।

একক ৯ – লেখক- পরিচয়ঃ গ্রন্থ-পরিচয়।

একক ১০ – সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা।

একক ১১ – সাহিত্যচর্চাঃ গঠনশৈলী ও ভাষা সংক্রান্ত আলচনাঃ টীকা, গ্রন্থপঞ্জি।

একক ১২ – সাহিত্যচর্চাঃ প্রবন্ধ সম্পর্কিত টীকাঃ ‘বাংলা শিশুসাহিত্য’।

একক ১৩ – প্রবন্ধ সংগ্রহঃ প্রমথ চৌধুরী ।

একক ১৪ – সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা এবং বস্তুতন্ত্রতা কি ।

কোর পত্র – ৩০২ (আবশ্যিক) প্রবন্ধ সাহিত্য

পর্যায় –ক

একক ১- প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র - বিবিধ প্রবন্ধ - বিবিধ প্রবন্ধঃ উদ্দেশ্য - পাঠ্য প্রবন্ধ সমূহের রচনা প্রেক্ষিত আলোচনা ।

একক ২ – প্রবন্ধ –উত্তরচরিত – উদ্দেশ্য- তৃতীয় অঙ্কের গুরুত্ব – আলোচনা – লক্ষ্য - বিষয়বস্তু – প্রতিপাদন - সমালোচনার দৃষ্টিকোণ।

একক ৩ - বিদ্যাপতি ও জয়দেব এবং শকুন্তলা,মিরান্দা ও দেসদিমোনা - বিদ্যাপতি ও জয়দেব – লক্ষ্য - বিষয়বস্তু – প্রতিপাদন - সমালোচনার দৃষ্টিকোণ - কিছু অপূর্ণতার কথা - শকুন্তলা মিরান্দা দেসদিমোনা – বৈসাদৃশ্য – তুলনীয় - লক্ষ্য - বিষয়বস্তু - তৃতীয় প্রস্তাবেই আসল বক্তব্য – প্রতিপাদন - সমালোচনার দৃষ্টিকোণ।

একক ৪ – গীতিকাব্য – আলোচনা - লক্ষ্য - বিষয়বস্তু – প্রতিপাদন - গীতিকাব্য সমালোচনার দৃষ্টিকোণ - অল্প কিছু অপূর্ণতা।

একক ৫ - বঙ্গাদেশের কৃষক - বঙ্গাদেশের কৃষক এর সাধারন আলোচনা – লক্ষ্য - বিষয়বস্তু – প্রতিপাদন - সমালোচনার দৃষ্টিকোণ ।

একক ৬ – দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা – জীবনী - সাহিত্য প্রতিভা - লক্ষ্য - বিষয়বস্তু – কবিত্ব – প্রতিপাদন - সমালোচনার দৃষ্টিকোণ ।

একক ৭ - আত্মচরিত - শিবনাথ শাস্ত্রী - ভূমিকা - লেখক পরিচিতি - আত্মজীবনী কী ও কেন - শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত – আলোচনা - আত্মচরিত গ্রন্থ অবলম্বনে শিবনাথ শাস্ত্রীর দাদু-দিদিমার পরিচয় - আত্মচরিত গ্রন্থ লেখক এর প্রপিতামহের ধর্ম ভাব - ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ এবং ব্রাহ্মচেতনা বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর ভূমিকা - শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত ‘আত্মচরিত’ গ্রন্থটি আত্মজীবনী সাহিত্যরূপ কতখানি সার্থক - ইংল্যান্ড যাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছিলেন তার পরিচয় ।

একক ১ - বিবিধ প্রবন্ধ- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - ভূমিকা

বিন্যাসক্রম

১.১ প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র

১.২ বিবিধ প্রবন্ধ

১.৩ বিবিধ প্রবন্ধঃ উদ্দেশ্য

১.৪ পাঠ্য প্রবন্ধ সমূহের রচনা প্রেক্ষিত আলোচনা

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র

রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে যে ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ মানুষরূপে অভিহিত করেছেন, তা নিছক স্তুতিবাদ নয়। একে প্রকৃত রসজ্ঞের রূপে অভিহিত করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত সৃষ্টি ও তাঁর দীপ্ত চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই মন্তব্য রমেশচন্দ্র করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা মজ্জাগত তা হল তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভা, তাঁর সৃষ্টিমূলক সাহিত্য। নিঃসন্দেহে সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর সৃষ্টিকৌশল ও রসোদ্ভাবনের পরিচয় দিয়েছেন। সৃষ্টিকৌশল অর্থে তিনি সৌন্দর্যসৃষ্টির উৎকর্ষকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই উৎকর্ষ নির্ভর করে স্বভাবানুকারিতা ও স্বভাব অতিক্রমকারী ক্ষমতার উপরে। যা প্রত্যক্ষগোচর তার অনুকরণে সাহিত্য হয় না, কেননা সাহিত্য প্রকৃতির আরশি মাত্র

নয়। সুতরাং এখানে আসে নির্বাচনের প্রশ্ন । ঔপন্যাসিক তাই তাঁর কল্পনা ও মননের শক্তিতে বাস্তব সত্যকে সার্থকতা সত্যে পরিণত করেন। এখানে প্রমাণিত হয় স্বভাব বা বাস্তব জীবনকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা। রসাে্দ্ভাবন অর্থে রসাত্মক বাক্য মাত্র নয়, চরিত্রের বিভিন্ন প্রকারের প্রবৃত্তির ভাবের রূপায়ণ। সুতরাং রস অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্র এখানে রূপসৃষ্টির সার্থকতার উপরে অধিকতর জোর দিয়েছেন। সুতরাং তা যুগপৎ সুষমাগত ও রীতি আশ্রিত। রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যের মূল্য নামক প্রবন্ধে বলেছেন 'রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। তার আর একটা দিক আছে, যেটা রূপের সৃষ্টি। তবুও উপন্যাস সৃষ্টি বঙ্কিম-প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় বহন করে না। তাঁর মননশীলতা মানব জীবনের সকল দিকে প্রসারিত হয়ে বিচার, বিশ্লেষণ ও পথ-নির্দেশ করতে চেয়েছিল। উপন্যাস। সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হল কাহিনি-বিন্যাস বা আখ্যান, চরিত্র বিশ্লেষণ ও লেখকের জীবনদর্শন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে জীবনের স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়োজন অপরিহার্য বলে মননশীলতায় স্থান প্রসারিত। তথাপি এখানে সীমাবদ্ধতা আছে, কেননা উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লেখককে জীবনদর্শন পরিস্ফুট করতে হয়। সুতরাং কাহিনি তার শাখায়িত বিস্তারকে আশ্রয় করে নিছক রসসৃষ্টি অপেক্ষা যতই বিশ্লেষণমূলক হয়, ততই তথায় তত্ত্বকে

পরিস্ফুট করবার সুযোগ বেশি পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তার ত্রয়ী উপন্যাস আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামে তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। এই তত্ত্ব হল 'ধর্মতত্ত্বে' ব্যাখ্যাত অনুশীলন তত্ত্ব অনুশীলন তত্ত্ব কর্মাত্মক। মানুষের মধ্যে যে বৃত্তিসমূহ আছে তাদের উচ্ছেদ নয়, সামঞ্জস্য সাধনজনিত পরিতৃপ্তি, সুখলাভের উপায়। সামঞ্জস্যের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। এর ফলে সকল বৃত্তির বিকাশে মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়।

অনুশীলন তত্ত্বের অপর দিকটি হল কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম নিষ্কাম তা বিধেয়। নিষ্কাম কর্মসাধনার মাধ্যমে ভক্তি অর্জন করা যায়। প্রকৃত জ্ঞান হল সকল জীবকে আত্মায় ও ঈশ্বরে দেখতে পাওয়া। কর্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। কর্মে চিত্তশুদ্ধি হয়ে অজ্ঞানলাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সেই জ্ঞান নিঃশ্রেয়স। প্রীতিবৃত্তি অনুশীলন ধর্মের অঙ্গ। প্রীতি ও ভক্তি অভিন্ন। প্রীতি পারিবারিক

গণ্ডি ত্যাগ করে সমাজ ও সার্বলৌকিক জীবনে প্রসারিত হয়। সমাজের অপর নাম দেশ। 'সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না'—এই কথা বলে গুরু তাঁর ধর্মব্যাখ্যা সমাপ্ত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তার অনুশীলন তত্ত্বকে তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে কাহিনির মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন। তবে এই তত্ত্বকে স্বচ্ছন্দভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন, কেননা, উপন্যাস শিল্প-তত্ত্বের ধর্ম অনুযায়ী তা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য।

আনন্দমঠ (১৮৮২) বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্মবোধের দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন। সত্যানন্দের নেতৃত্বে সন্তানসৈন্যদল ইংরেজবাহিনীকে যুদ্ধে দু'বার পরাভূত করেন। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে ইংরেজ যোদ্ধা ও সিপাহীগণের মধ্যে কেউ আর ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নিকটে সংবাদ দেবার জন্য জীবিত ছিল না। সত্যানন্দ সন্তান-রাজ্য প্রতিষ্ঠার আদেশ দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহাপুরুষ এসে সত্যানন্দকে প্রকৃত জ্ঞানদানের নিমিত্ত হিমালয়ে নিয়ে যান। তিনি বললেন যে সত্যানন্দের কর্মসাধনা নিষ্কাম নয়। কেননা তা অজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়নি। কর্ম ভক্তিকে উদ্রিক করে বটে, কিন্তু সত্যানন্দের ভক্তি শুদ্ধ নয়। তাঁর অন্যায়ল জয় মঙ্গলের প্রতিকূল। ইংরেজগণের রাজ্য-প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন, কেননা তাদের নিকট থেকে লৌকিক বিদ্যা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ভারতবাসীর আছে।

দেশপ্রীতি যেরূপ আনন্দমঠের বিষয়বস্তু, ধর্ম তদ্রুপ দেবী চৌধুরাণীর। ভবানী পাঠক তাঁর দস্যুবৃত্তি ও পরহিতব্রতের মাধ্যমে নিষ্কাম ধর্মকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত প্রফুল্লর মাধ্যমে এই ধর্মকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। দেবী চৌধুরাণী প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রফুল্ল দেশনায়িকার পদ ত্যাগ করে অত্যন্ত সহজে সংসারে প্রবেশ করেছে। তত্ত্ব উপস্থাপিত হলেও এই উপন্যাসের শিল্প-গুণ 'আনন্দমঠ' অপেক্ষা অনেক বেশি। 'আনন্দমঠে দেশাত্মবোধ এক বিরাট আদর্শবোধের পটভূমিকায় অঙ্কিত হয়েছে। সমগ্র জাতির জীবন-সাধনা যেন এর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেবী চৌধুরাণীতে যদি নিষ্কাম ধর্মের তত্ত্ব উপন্যাস থেকে বর্জিত হয় তবুও তার শিল্পোৎকর্ষ ক্ষুন্ন হয় না। প্রফুল্লর মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র তত্ত্বকে

ব্যাখ্যা করেছেন, তবুও তার চরিত্রের মৌলিক গুণ সংসার-ধর্মের প্রতি আগ্রহ, পতিপ্রেম লাভের উন্মুখতা, সেবা মাধুর্যের বিস্তার, তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন অথবা নিয়ন্ত্রিত হয়নি।

সীতারাম (১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্ববাহী শেষ উপন্যাস। প্রবৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য বিধানে সুখ। কিন্তু শ্রীর রূপদর্শনে সীতারামের উন্মত্ততা, চিত্ত-বিশ্রামরূপ প্রমোদ-উদ্যান থেকে তাঁর পলায়নে তাঁর শোচনীয় মানসবিকার ও অধঃপতন এবং এর ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের ধংস তাঁর চরিত্রে বস্তুনিষ্ঠভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কাহিনির শেষ পর্বে সীতারাম তার অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের ফলে, ঘটনাবলীর অপরিহার্য প্রতিক্রিয়ায় ও মানসিক প্রবল আলোড়নে তাঁর পূর্ব চরিত্র-গৌরব ফিরে পেয়েছেন। এই রূপান্তর কোন অনৈসর্গিক কারণে সংঘটিত হয়নি, স্বাভাবিক নিয়মে হয়েছে। ম্যাকবেথের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। কেননা সীতারামের মধ্যে ছিল জীবন-প্রত্যয়, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সুগভীর আধ্যাত্মিক বিশ্বাস। সীতারামের পতনের কারণ হলো তার চরিত্রে প্রবৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়নি।

সুতরাং ত্রয়ী উপন্যাসে অনুশীলন তত্ত্বের দিকটি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু তাকে শিল্পধর্মের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছে। তত্ত্ব ব্যাখ্যা তাঁর ইঙ্গিত বস্তু হলেও উপন্যাসের পরিধির মধ্যে এর অবকাশ ছিল সীমিত। তাই তাঁকে অনুশীলন তত্ত্ব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য প্রবন্ধের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনে প্রথম থেকে জীবন ও জীবন-স্বরূপের রহস্য-চিন্তা দেখা দিয়েছিল। এর সূত্র ধরে তার মনে এসেছে ধর্মতত্ত্ব। আমাদের দেশে ধর্মের কোন পৃথক অভিধা নেই। ধর্ম কথাটি এত ব্যাপক ও জীবনাশ্রয়ী যে, এর কোন নাম হয় না। ধর্ম জীবনকে ধারণ করে আছে। সুতরাং এর ভিন্ন সংজ্ঞা সম্ভব নয়।

অধ্যাপক সীলী যে ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের মতের অনুকূল। The substance of religion is culture'—এই সংজ্ঞাটিকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

Religion in itself expresses in state of perfect Unity which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in

Society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical are made habitually to converge towards one common purpose. ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। মানুষের নৈতিক ও শারীরিক বৃত্তিসমূহ উক্ত সংযোগ সাধনের জন্য নিয়োজিত হয়। ধর্ম ব্যক্তিজীবনের বৃত্তিসমূহ নিয়ন্ত্রিত করে থাকে ও সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ধর্মের প্রকৃতি গীতায় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হয়েছে।

'সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্মজীবন নাই'-ব্যক্তি ও সমাজকে নিয়ে চিন্তাধারা উপন্যাসে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করবার উপায় ছিল না। সমাজ ধ্বংসে যখন ধর্ম ও মানুষের সমস্ত মাল ধ্বংস হয়, তখন সমাজ-রক্ষা সর্বপ্রধান কর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে সমাজ ও দেশ অভিন্ন বলে তিনি দেশপ্রীতিকে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। এর সঙ্গে সার্বলৌকিক প্রীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এদের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা ব্যক্তি ও সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সমাজের মধ্যে ব্যক্তিজীবনের বিকাশ ঘটে। তাই সমাজকে কেন্দ্রবিন্দুরূপে গ্রহণ করে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ চিন্তা, সাহিত্য-সৃষ্টি, সমাজ ও অর্থনীতি, ইতিহাস-জিজ্ঞাসা ও ধর্ম এবং দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এখানে তাই প্রয়োজন ঘটেছে প্রবন্ধ রচনার।

'সীতারাম' রচনার পরে সাত বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি আর কোন উপন্যাস রচনা করেননি। তবে উত্তরকালে তিনি প্রবাদি রচনা করে জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন।

ঔপন্যাসিক জীবন থেকে, রসসৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে বিদায়ের আয়োজন ত্রয়ী উপন্যাসে সূচিত হয়েছিল। এখানে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা শিল্পীর মনকে অধিকার করেছিল। উপন্যাসে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা থাকলেও তত্তরপের সার্থক প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ-সাহিত্য প্রতীক্ষা করছিল। তাই বিবিধ প্রবন্ধে কৃষ্ণচরিত্রে, ধর্মতত্ত্বে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় তিনি তত্ত্ব জিজ্ঞাসাকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন। এখানে স্বদেশ ও স্বজাতির নানা প্রসঙ্গ, জীবন-রহস্যের পরিচয়, ধর্ম ও জীবনের গভীর সম্পর্ক অভিব্যক্ত ও আলোচিত হয়েছে।

প্রবন্ধের পরিচয় লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর ও মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিতেও আছে। কিন্তু এই গ্রন্থগুলি মননধর্মিতার, যুক্তি ও বিচারের অভ্রান্ত পরিসূচক প্রবন্ধ নয়। এইগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা সুগ্রথিত কাহিনি বিন্যাস ও পরিণাম আশ্রয় না করলেও রসাশ্রয়ী কল্পনা, পরিহাসমার্জিত কৌতুক ও ব্যঙ্গাকে পরিহার করতে পারেনি। এক প্রকারের লঘু চপল। মনোবৃত্তি কখনও পরিহাস, কখনও বা বিদ্রুপের বাতাবরণে দেখা দিয়েছে। এ-যেন এক প্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সহজ সুরে গভীর কথা বলবার আয়োজন, একটি সূক্ষ্ম আবরণ সম্মুখে রেখে অন্তরের উপলব্ধ সত্যকে জানবার প্রয়াস। আরো একটি প্রয়োজন পশ্চাতে কাজ করেছে। 'বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা ভার গ্রহণ করে তার পৃষ্ঠা পূরণের জন্য ও পাঠকবর্গের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্য বঙ্কিমচন্দ্রকে পরিহাস ও ব্যঙ্গের ছলে নানা বিষয়ের অবতারণা করতে হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে এদের লঘু মনে হলেও, তারা লঘু নয়। হাল্কা মেজাজে লেখা হলেও এরা জীবনের দাবী পূর্ণ করেছে।

'লোকরহস্যে' ঐতিহাভ্রষ্ট, পশ্চিমের রীতিনীতির অনুকরণকারী ইংরেজি-শিক্ষিতদের আচরণ, দেশীয় ডেপুটিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিচার-প্রহসন, সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদের মহতী সভার মাধ্যমে নাগরিক সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে তীক্ষ বিদ্রুপ করা হয়েছে। পরিহাসের গণ্ডি অতিক্রম করে ব্যঙ্গ শাণিত হয়ে সভ্যতাভিমানের নির্মোককে আঘাত করেছে। একমাত্র 'সুবর্ণগোলক' বঙ্কিমচন্দ্রের বিশুদ্ধ হাস্যরসে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। এখানে রসোদ্ভাবনের দিকটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থে বঙ্কিম-প্রতিভা যেন দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে জীবনে স্বাভাবিক রূপে বিষাদের ছায়া প্রসারিত হয়। তার কারণ তখন ব্রয়াণ্ডব্যাপিনী আশা থাকে না। তখন জানা যায় সংসার চক্রে আরোহণ করলে "যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে।" তথাপি কমলাকান্ত 'আমার মনে' পাশ্চাত্য দেশের মেটিরিয়ালিজমের আদর্শ গ্রহণের জন্য জীবন থেকে সুখের অন্তর্ধান সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে, পরহিতসাধন ব্যতীত প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না। পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। আবার 'বুড়া বয়সের কথায় লিখেছেন যে, যৌবনে নিজের কাজ করতে সময় ব্যয় হয়। যৌবন শেষ হলে

পরের কাজ করা কর্তব্য। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। ঈশ্বরচিন্তা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন "শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে'। তিনি বলেছেন 'বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়। নিষ্কাম ধর্মের একদিক হলো ঈশ্বরোক্লিষ্ট কর্ম ও অন্যদিক হলো পত্রের মঙ্গলসাধন। কর্মে চিত্তশুদ্ধি ঘটে ও তার ফলে হিতসাধনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। বার্ধক্যে মানুষ একা। কোথাও যেন কোন আশ্রয় নেই। তরুণীগণের কটাক্ষ আর বর্ষিত হয় না, মিল-কোত স্পেন্সর প্রতি মনোরঞ্জন করে না, দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অন্ধের মৃগয়া । 'অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে অন্ধকার, প্রভো। চারিদিকেই অন্ধকার। আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভল্লে বড় ভারি হইয়াছে । আমায় কে রক্ষা করিবে ?' এই যে আত্মসমর্পণের সুর তা ভক্তির নামান্তর এবং তা কমলাকান্তের মানব-প্রীতির পরিচায়ক।

'একা' প্রবন্ধে ধর্মতত্ত্বের মূল কথাটি আলোচিত হয়েছে। মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ধর্ম নেই, প্রীতি ও ভক্তি অভিন্ন। কমলাকান্ত বার্ধক্যে উপনীত হয়ে মনুষ্যকর্মজাত সঙ্গীত নয়, সংসারে অপর এক সঙ্গীত শুনতে আগ্রহী। 'সংসার-রসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। এই সঙ্গীত অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় এই গীতধ্বনি হলো "প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।" মনুষ্যজাতির উপরে যদি তাঁর প্রীতি বজায় থাকে তবে তিনি অন্য সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষিত নন।

বড়বাজার, ঢেঁকি, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রবন্ধে পরিহাসের সঙ্গে ব্যঙ্গা মিশ্রিত হয়ে তাকে উপভোগ্য করে তুলেছে। মনুষ্যজীবনে নানা অসঙ্গতি ত্রুটি-বিচ্যুতি, জীবনের সঙ্গে জীবনচর্যার দ্বন্দ্ব এখানে পরিহাসের বিষয়বস্তু। কমলাকান্ত জীবন-রসিক; তাই তিনি জীবনকে তির্যক কোণ থেকে দেখেছেন। নৈরাশ্য নয়, শিল্পী-মনের আনন্দ এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

সংসার প্রকৃতপক্ষে পণ্য-বিপণি। এখানে বিক্রেতা-ক্রেতার ভিড়। মূল্যের বিনিময়ে এখানে রূপ, যশ, বিদ্যা, বিচার প্রভৃতি বিক্রয় হয়। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। মাছের বাজারে দালালের নাম পুরোহিত। সেখানে দর হলো জীবনসর্বস্ব। কিন্তু সেখানে

চড়া দামে যা কেনা যায় তা অল্পদিন পরে দুর্গন্ধ হয়ে যায়। যশের বাজারে বড় বে-বন্দোবস্ত। ‘কেহ সর্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না—কেহ শুধু সেলামে দেড় মণ লইয়া যাইতেছে ।’ বিচারের বাজার হলো কসাইখানা—ছোট বড় কসাই ছুরি নিয়ে গোরু কাটছে। গোরু হলো বিচারপ্রার্থী দরিদ্র মানুষ। কমলাকান্ত দেখলেন তিনি স্বয়ং দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি নিয়ে বসে আছেন। আপনি ঘোল খাচ্ছেন ও পরকে খাওয়াচ্ছেন। মৌতাত ভাঙ্গলে তিনি দেখলেন যে, প্রসন্ন গোয়ালিনী তাঁর জন্য ঘোল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রমণী পাদপদ্মের তাড়নায় ঢেঁকির খানায় পড়া দেখে কমলাকান্তের দার্শনিক প্রত্যয় হলো, এ সংসার ঢেঁকিশাল। বঙ্গদেশে ঢেঁকির দলের বিদ্যা বুদ্ধি সব রাঙ্গা চরণের কোমল পদাঘাতে। তার এ বিদ্যা হলো খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে ‘ধান্য’, পুরস্কারের মধ্যে রাঙ্গা পা। ঢেঁকির মাহাত্ম্য অপ্রতিহত, প্রভাবও নিরকুশ। কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি প্রজাগণের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষে নূতন নিরিখরূপ চাল বের করছেন, আইন কারক মিনিট রিপোর্টের রাশি পিষে আইন বের করেছেন, বিচারক বের করেছেন দারিদ্র্য, কারাবাস, বাবু, ঢেঁকি বের করছেন বোতল গড়ে পিতৃধন পিষে পিলে যকৃৎ আর গৃহিণী টেকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিয়ে বের করছেন অনাহার। সর্বাপেক্ষা 'ভয়ঙ্কর হলো লেখক ঢেঁকি, সরস্বতীর মুণ্ড ছান্দার গড়ে পিষে বের করেছেন স্কুল বুক।

সংসার বহ্নিময়; এখানে জ্ঞান, রূপ, ধন, মান, ধর্ম, ইন্দ্রিয় বহ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত। বহ্নি কাচের দ্বারা আবৃত বলে সকলে ঝাঁপ দিতে গিয়ে প্রতিহত হয়। এই বহ্নি দাহ কাব্যে বর্নিত হয়। মানবহ্নিতে দুর্যোধনের ভোগবহ্নিতে আন্টনি-ক্লিওপেট্রার, ঈর্ষাবহ্নিতে ওথেলো, স্নেহবহ্নিতে জানকীর দহনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মনুষ্য সত্যই পতঙ্গ। জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় আত্মসমর্পণ করতে চায়। ‘মনুষ্যফল’ প্রবন্ধেও কমলাকান্ত নানাশ্রেণির মানুষকে নানা ফলরূপে দেখেছেন। দেশহিতৈষিগণ শিমুল ফুল, লেখকগণ তেতুল, দেশি হাকিমের কুষ্মাণ্ড ও সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য, কদর্য ও টক ফল হলো স্বয়ং শ্রীকমলাকান্ত।

পরিহাস ও ব্যঙ্গ কমলাকান্তের জীবন সম্পর্কে তির্যক দৃষ্টির রূপকাবরণ-এর মাধ্যমে তার জীবনসক্তি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি জীবনকে সুন্দর করে পেতে চান বলে তার পরিহাসের বহিরাবরণ। কিন্তু তাঁর প্রকৃত বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে জীবন-দর্শন ও দেশাত্মবোধে। 'একা', 'একটি গীতে' ও 'আমার দুর্গোৎসবে' তাঁর দেশপ্রীতি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারিত হয়েছে। কমলাকান্তে যে মাতৃপূজার উদ্বোধন, আনন্দমঠে এসে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও ভক্তির মন্ত্রে এই পূজা সম্পন্ন হয়েছে।

কমলাকান্ত কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে এসেছেন। জননী আমাদের বঙ্গভূমি, মৃন্ময়ী, মৃত্তিকারূপিণী, অনন্তরত্নভূষিতা। রত্নমণ্ডিত দশভূজা—দশদিক—দশ দিকে প্রসারিত, নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত। পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শনিপীড়নে নিযুক্ত । পরাধীন দেশে এ মূর্তি এখন প্রত্যক্ষ করা যাবে না।

আজি দেখিব না, কাল দেখিব না কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না কিন্তু একদিন দেখিব—দিভুজ, নানা প্রহরণ-প্রহারিণী, শত্রু-মদিণী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠা-বিহারিণী দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমুর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপীণ গণেশ, আমি সেই কালস্রোতের মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গাপ্রতিমা।

যে দেশলক্ষ্মী গঙ্গার অতলজলে নিমজ্জিত হয়েছিলেন সত্যানন্দ ভক্তির প্রাবল্যে তাঁর মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশমাতৃকা তার সন্তানগণের সেবায় ও নিষ্ঠার অন্তরে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁকে লাভ করবার উপায় হলো স্বার্থচিন্তা পরিহার, ভ্রাতৃবৎসলতা, পরের মঙ্গলসাধন এবং অধর্ম, আলস্য ও ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ। 'আনন্দমঠে' দেশসেবার জন্য শুধু জীবন দান যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়নি। তথায় ভক্তির উপর গুরুত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সারস্বত সাধনায় অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সমাজ চিন্তা স্বভাবতঃ অর্থনৈতিক বিন্যাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। যে মেটিরিয়েল প্রসপেরিটির কথা আমার মনে তিনি আলোচনা করেছেন তারই সূত্র ধরে তিনি 'বিড়াল' প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন যে অর্থবণ্টনের অসাম্য সমাজে ধনীতি ও দারিদ্র্য সৃষ্টি করে।

মন্তব্য

সামাজিক ধনবৃদ্ধি সমাজের উন্নতি সূচিত করে। এই হেতু প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্ষমতা অনুযায়ী ধন সঞ্চয় ও ধন সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু এই রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মার্জারী গ্রহণ করতে সম্মত হলো না। সে যুক্তি উপস্থাপিত করলো সামাজিক উন্নতির সঙ্গে অধিকার-বণিত দরিদ্র জনসাধারণের সম্পর্ক যদি না থাকে তবে জাতীয় আয়বৃদ্ধির নৈয়ায়িক যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। অভাবহেতু সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়—মার্জারী এই যুক্তির দ্বারা বঞ্চিত মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। বিবিধ প্রবন্ধে বঙ্গদেশের কৃষক' অধ্যায়ে এই সমস্যা বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে বিস্তৃত রূপে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা। 'কমলাকান্তে' বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস জিজ্ঞাসা 'বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব' ও 'একটি গীত' প্রবন্ধদ্বয় অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'একটি গীত' প্রবন্ধে বর্তমান কালে শ্মশানভূমি নবদ্বীপের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয় করেছিল। সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেষ্টন করে অদ্যাপি কলধৌতবাহিনী গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

এখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাহার পা ধুয়াইতে সেই মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে সেই আনন্দপিণী কোথায় ?

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ইতিহাস-জিজ্ঞাসু মনকে অতীতের দিকে প্রসারিত করেছেন। তিনি যেন মনশ্চতে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, অন্ধ পদশব্দে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত হলো, কাল পূর্ণ দেখে নবদ্বীপ থেকে বাঙ্গালীর লক্ষ্মী অন্তর্হিত হলেন। ইতিহাসের দৃষ্টির সঙ্গে কবি-কল্পনা এসে মিলিত হলো।

দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকায় দীপমালা নিভিয়া গেল, পূজা গৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না, পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রাম শিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনা রাোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর গাঢ়তর গাঢ়তর অন্ধকারে দিক ব্যাপিল।

‘কমলাকান্তের দপ্তরে যে ইতিহাস-জিজ্ঞাসার সুর ‘বিবিধ প্রবন্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা আলোচনায়, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রসঙ্গে তা পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তাঁর কবি-কল্পনা ও অনুভূতিকে দূরে সরিয়ে রেখে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে ইতিহাস বিচার করেছেন।

১.২ বিবিধ প্রবন্ধ

বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ‘বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬) এবং প্রবন্ধ পুস্তক (১৮৭৯) প্রকাশ করেছিলেন। এই দুটি গ্রন্থ একত্রিত করে তিনি বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন। অধিকাংশ প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, অল্প। কিছু প্রবন্ধ ‘প্রচার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বিবিধ প্রবন্ধের প্রবন্ধসমূহকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

(ক) সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প, (খ) ইতিহাস, (গ) ধর্ম ও দর্শন, (ঘ) শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতি।

প্রথম পর্বে অর্থাৎ সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক আলোচনাসমূহের মধ্যে উত্তর-চরিত, গীতিকাব্য, প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত, বিদ্যাপতি ও জয়দেব, সঙ্গীত, আর্য জাতির সূক্ষ্ম শিল্প, শকুন্তলা, মিরান্দা এবং দেসসিমোনা, এবং শকুন্তলা ও দেসদিমোনা, ধর্ম এবং সাহিত্য, বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি, সঙ্গীত, বাঙ্গালা ভাষা প্রভৃতি উল্লেখযাোগ্য।

ভারত কলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, বঙ্গিালীর উৎপত্তি, রঙ্গো ব্রাত্মণ্যাধিকার, বাঙ্গালা শাসনের কাল, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার। কলঙ্ক, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ প্রভৃতি ইতিহাস-জিজ্ঞাসার অন্তর্ভুক্ত।

মন্তব্য

ভালবাসার অত্যাচার, কাম, জ্ঞান, সংখ্যা দর্শন, চিত্তশুদ্ধি, গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি, ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে, মনুষ্যত্ব কি প্রভৃতি প্রবন্ধ—ধর্ম ও দর্শন আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ হলো অনুকরণ, বাঙ্গালির বাহুবল, প্রাচীন ও নবীনা, তিন রকম, বহুবিবাহ, বাহুবল ও বাক্যবল, দ্রৌপদী ও বঙ্গদেশের কৃষক। বঙ্কিমচন্দ্রের এই যে নানা শ্রেণির প্রবন্ধ, যাদের মাধ্যমে তিনি জীবন-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তার মূলে একটি ভাবগত ঐক্য আছে। মানব-জীবনকে সার্থক করে তুলতে হলে সকল বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করতে হবে, নহিলে সকল কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্মই নামান্তরে ভক্তি এইরূপে 'কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য। জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি, জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ কি, তা জানা ধর্ম। অতএব জানাই ধর্ম, জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স। সকল কিছুর মূলে কর্ম, কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানলাভ করতে হয়।

আরুরুক্ষোমুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।

যোগারূঢ়স্যতস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ||

জ্ঞানযোগে যিনি আরোহণেচ্ছু কর্ম তাঁর তদারোহণের কারণ। সমাজ কর্মাকামী মানুষের আশ্রয় । সমাজ সংহত ও সুন্দর হলে মানুষের ধর্মজীবন বিকশিত হয়। সমাজ-ধ্বংসে মানুষের ধর্ম রক্ষা পায় না। সুতরাং সকল কিছুর বিনিময়ে সমাজ-রক্ষা অপরিহার্য। আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম—সমাজ ও দেশকে এক অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছেন।এই হেতু 'বিবিধ প্রবন্ধে' সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, ইতিহাস, ধর্ম ও দর্শন এবং শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ে যে আলোচনা তিনি করেছেন তাঁর মূলে আছে তার মানব-প্রীতি। তার প্রীতি নির্বস্তুক ভাবমাত্র নয়। 'সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।' সমাজ-জীবনকে আশ্রয় করে তা প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে সমাজ ও দেশ তাই এক। এর রক্ষা ও উন্নতির জন্য আত্মরক্ষা ও স্বজন রক্ষার চিন্তাও ত্যাগ করা কর্তব্য। 'কেন না, তোমার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশ মাত্র, সমুদায়ের জন্য অংশমাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয়।'

স্বদেশপ্রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে অভিহিত করেছেন। এই স্বদেশপ্রীতি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসমূহকে প্রেরণা জুগিয়েছে।

জীবনরহস্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই উত্তর পেয়েছিলেন। তথাপি পাশ্চাত্য মনীষীদের মত তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এঁদের মধ্যে অগস্ত কোঁতের ধর্মব্যাখ্যা তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার মতে ধর্ম মানুষের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে। তার নৈতিক ও শারীরিক বৃত্তিসমূহ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে সম্মিলিত হয়। তিনি বলেছেনঃ

Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying point for all the separate individuals.

১.৩ বিবিধ প্রবন্ধঃ উদ্দেশ্য

'বিবিধ প্রবন্ধ" এবং "বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ"-এ বিন্যস্ত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাবন্ধিক জীবনের প্রথম অর্ধের রচনা আটত্রিশটি প্রবন্ধ। সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস, সমাজ বিষয়ে রচিত এই মননগভীর প্রবন্ধ গুচ্ছ থেকে পাঠ্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে সাতটি প্রবন্ধ। - এগুলির মধ্যে 'উত্তরচরিত', ' আর্য জাতির সূক্ষ্ম শিল্প,'—এই দুটি আছে "বিবিধ প্রবন্ধ'-এ; "বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন", "বঙ্গদেশের কৃষক" "বহুবিবাহ", "বাঙ্গালা ভাষা", "বাঙ্গলার ইতিহাস" । — এই পাঁচটি প্রবন্ধ আছে 'বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ'-এ। এই সাতটি প্রবন্ধের রচনা প্রেক্ষিত এবং বিষয়, পরিচয় দানই বর্তমান এককের উদ্দেশ্য। এজন্য এই এককটিকে দুটি মূল ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম ভাগে আছে প্রবন্ধ সমূহের রচনা, ইতিহাস এবং প্রকাশ -বিবরণ এবং গ্রন্থভুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ।

এইভাবে প্রবন্ধ-প্রেক্ষিতের পরিচয় দিয়ে রচনাকালের বৈশিষ্ট্য এবং বঙ্কিম-মানসের গঠনবিশেষত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করাই এ অংশের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় ভাগে বিষয়ানুক্রমে বিন্যস্ত করে এই সাত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে। পঠনীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি এ অংশের উদ্দেশ্য।

বর্তমান এককের শেষে একটি অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ ও সাবলীল করে তোলাই এই অংশের উদ্দেশ্য।

সংক্ষেপে বলা যায় পঠনীয় বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করাই এই এককের মূল উদ্দেশ্য।

১.৪ পাঠ্য প্রবন্ধ সমূহের রচনা প্রেক্ষিত আলোচনা

‘বিবিধ প্রবন্ধ’(১৮৮৭) ও ‘বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ’ (১৮৯২) – দুই সংকলনের নানা বিষয়ে রচিত প্রবন্ধের মধ্যে পাঠ্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে সাতটি প্রবন্ধ। এগুলির মধ্যে সাহিত্য ও ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা তিন “উত্তরচরিত’ ‘বাঙ্গালা ভাষা', 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন; ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধের নাম ‘বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বঙ্গদেশের কৃষক” এবং “বহুবিবাহ’। 'আর্য জাতির সূক্ষ্ম শিল্প’ বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্যভাবনার পরিচায়ক। সাতটি প্রবন্ধের মধ্যে একটি প্রচার’-এ, বাকি ছ-টি ‘বঙ্গদর্শন' -এর বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। ‘বঙ্গ দেশের কৃষক’ আর ‘বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' ব্যতীত বাকি পাঁচটি প্রথমে সমকালে প্রকাশিত বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা হিসেবে লেখা হয়। সাময়িক পত্রে পুস্তক সমালোচনা অবশ্য আগেই শুরু হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ” (১৮৫১)-তে প্রকাশিত হত পুস্তক সমালোচনা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক সমালোচনার মতো রসানুভূতির বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি সে সব সমালোচনায় ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম গ্রন্থ-সমালোচনাকে করে তুলেছিলেন অনুভব-গাঢ় সাহিত্য। সমালোচনাগুলির স্বতন্ত্র সাহিত্য স্বাদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই সেগুলিকে পৃথক প্রবন্ধ রূপে গ্রন্থবদ্ধ করার সময় তিনি বাদ দিয়েছিলেন গ্রন্থ -সংক্রান্ত অংশ সমূহ।

‘বঙ্গদর্শন'-এ মুদ্রিত সমালোচনার সংকলন “বিবিধ সমালোচনা” (১৮৭৬)-এর ‘বিজ্ঞাপন’ নামক ভূমিকাংশটি আমরা প্রসঙ্গত মনে করতে পারি। “বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে স্থানে পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুলি প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্য বিষয়ক মূল কথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে।” ‘উত্তরচরিত’, ‘আর্য্য জাতির সূক্ষ্ম শিল্প’, ‘বাঙ্গালা ভাষা’, ‘বাঙ্গলার ইতিহাস’, ‘বহুবিবাহ’— এই পাঁচটি পাঠ্য প্রবন্ধগ্রন্থ সমালোচনা হিসেবে প্রথম মুদ্রিত হয়।

নৃসিংহপ্রসাদ বিদ্যারত্ন ভবভূতির “উত্তররাম চরিতম্” নামক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন উত্তরচরিত নামে। এই বইটির সমালোচনা সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ উত্তরচরিত’, ‘বঙ্গদর্শন'-এর এই প্রথম। পুস্তক সমালোচনাটি ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ('বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ব.)য়। শেষ হয় এই বছরের ষষ্ঠ সংখ্যায় (আশ্বিন, ১২৭৯ব.)। সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক এই প্রথম বাংলা প্রবন্ধটির মার্জিত রূপ 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬)-য় প্রকাশিত হয়। পরে ‘উত্তরচরিত’, ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ (১৮৮৭)-র অন্তর্ভুক্ত হয়।

“বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন” প্রথম প্রকাশিত হয় ‘প্রচার’ পত্রিকার ১২৯১ (১৮৮৪) বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায়। প্রবন্ধটি “বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ" -এ স্থান পেয়েছে।

মোট বারোটি সূত্রের সমষ্টি এই নিবন্ধটি বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-গভীরতা এবং বাঙালি সাহিত্যিকদের প্রতি প্রীতির প্রমাণ দেয়।

“বাঙ্গালা ভাষা” লিখিত হয় রামগতি ন্যায়রত্ন রচিত প্রখ্যাত গ্রন্থ ‘বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব প্রথম ভাগ’ -এর সমালোচনা সূত্রে। এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন’-এর ১২৮৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (মে, ১৮৭৮)। এটি পরে "বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ” –এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

মন্তব্য

“আর্য জাতির স শিল্প” রচিত হয় পুস্তক সমালোচনা হিসেবে। প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় (ভাদ্র ১২৮১ ব.)। সমালোচিত গ্রন্থটির নাম 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পাচাতুরী', রচয়িতা শ্যামাচরণ শ্রীমানি। প্রবন্ধটির মার্জিত রূপ “বিবিধ প্রবন্ধ' -এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস’ গ্রন্থের সমালোচনা হিসেবে লেখা হয়।“ বাঙ্গালার ইতিহাস” প্রবন্ধটি ‘বঙ্গদর্শন’ তৃতীয় বর্ষ দশম সংখ্যা (মাঘ ১২৮১ ব.)-য় প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। পরে এটি “বিবিধ দ্বিতীয় ভাগ’-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

‘বঙ্গদেশের কৃষক' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটির শিরোনাম যুক্ত চারটি পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ও বর্ষের পঞ্চম (১২৭৯ ব.), সপ্তম (কার্তিক ১২৭ ১৮ ব.), নবম (পৌষ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ), একাদশ (ফান ১২৭৯ ব। সংখ্যায়। তারপর প্রবন্ধটির অংশবিশেষ ‘সাম্য’ (১৮৭৯)-নামক পাঁচ পরিচ্ছেদ যুক্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ রূপে বিন্যস্ত হয়।

পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য'-এর প্রচার বহিত করেন; ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ ‘বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রবন্ধটির সূচনায় বন্ধানী মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন একটি দীর্ঘ ভূমিকা। সেখানে তাঁর বক্তব্য— ‘বঙ্গদেশের কৃষক’-এ। কৃষকদের (য়ে দুর্দশার কথা বলা হয়েছে বর্তমানে তা আর নেই। নতুন আইনে কমেছে জমিদারের অত্যাচার আর ক্ষমতা। অনেক স্থানে অত্যাচারী জমিদার দুর্বল হয়েছে। তাই তিনি বহু দিন প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ করেননি। এই বিবৃতির পর তিনি এটি পুনর্মুদ্রণের পাঁচটি কারণ দেখিয়েছেন- “(১) ইহাতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে দেশের যে অবস্থা বা ছিল, তাহা জানা যায়। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তার ইহা কার্যে লাগিতে পারে। (২) ইহার পর হইতে কৃষকদিগের অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার প্রথম সূত্রপাত, সুতরাং পুনর্মুদ্রিত হইবার এ প্রবন্ধ একটু দাবি দাও রাখে। (৩) ইহাতে কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এখনও অনেক প্রদেশে অপরিবর্তিতই আছে। যতগুলি উৎপাতের কথা আছে তাহা সব কোনো স্থানেই এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। (৪) এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয় তখন কিছু যশোলাভ

করিয়াছিল এবং (৫) আমি বঙ্গদর্শনে “সাম্য" নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পশ্চাৎ তাহা। পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলাম। "বঙ্গদেশের কৃষক" আর পুনর্মুদ্রিত করিব না বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ ‘সাম্য’ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই ‘সাম্য' শীর্ষক পুস্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছি। সুতরাং “বঙ্গদেশের কৃষক” পুনমুদ্রিত করার আর একটা কারণ হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্র ঘটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রান্তিশূন্য মনে করি না। কিন্তু অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে নোন নকথা ভ্রান্তি, আর কোন কথা ধ্রুব সত্য ইহা নিশিচত করা দুঃসাধ্য। অতএব কোন প্রকার সংশাোধনের চেষ্টা করিলাম না।” (বঙ্কিম রচনাবলী, সম্পাদনা ক্ষুদিরাম দাস, মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৮৩, পৃ. ৫৩৭)।

অর্থাৎ “বঙ্গদেশের যকই 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত একমাত্র প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ কালে যার কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় সমাজবিষয়ক প্রবন্ধ “বহুবিবাহ” গ্রন্থ-সমালোচনা উপলক্ষ্যে রচিত। সমালোচ্য গ্রন্থটি ছিল দশর বিদ্যাসাগরের “বহু বিবাহ বহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তক” (১৮৭৩)। সমালোচনাটি মুদ্রিত হয় দ্বিতীয় বর্ষের ‘বঙ্গদর্শন' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় (আষাঢ় ১২৮০ ব.)।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম থেকেই ছিলেন বিদ্যাসাগর -বিরোধী। তার সেই বিরোধিতা ‘বাঙ্গালা ভাষা’ প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের ভাষার সমালোচনায় কাপ পেয়েছে। আর “বহুবিবাহ" সমালোচনাটিতে তা হয়ে উঠেছে তীব্র। তাই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশের দীর্ঘ সময় পরে মার্জিত আকাত্রে “বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ড"-এ সন্নিবিষ্ট হয়। এই প্রবন্ধের শুরুতে বঙ্কিমচন্দ্র বন্ধনীভূক্ত একটি ভূমিকা দিয়েছেন—যাতে পাই প্রবন্ধটির প্রেক্ষিত স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। “বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্ত্তবানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল

হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয় বার তাহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাহাকে শ্রদ্ধা করে। এবং আমিও তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়াছি।" এবং ভবিষ্যতে যাতে এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচার হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি "প্রবন্ধটির প্রথমাংশ মুদ্রিত করিলাম। ইচ্ছা ছিল যে এসময়ে ইহা পুনর্মুদ্রিত করিব না, কিন্তু তাহা না করিলে আমার জীবদ্দশায় উহা আর পুনর্মুদ্রিত হইবে কি না সন্দেহ। উহা বিলুপ্ত করাও অবৈধ; কেন না ভাল হউক মন্দ হউ ইহা আমাদের দেশে আধুনিক সমাজসংস্কারের ইতিহাসের অংশ... উহার দ্বারাই বহুবিবাহ বিষয়ক আন্দোলন নির্বাপিত হয়, এই রূপ প্রসিদ্ধি। ... এখনও Malabari সম্প্রদায় প্রবল—তাহার না পারেন, এমন কাজ নাই।" (তদেব, পৃ. ৫৪৯)

প্রবন্ধ সমূহ রচনার এই প্রেক্ষিত বঙ্কিম-প্রতিভার দীপ্তি ব্যাপ্তি, ও গভীরতার প্রমাণ। এ অংশ বুঝিয়ে দেয় বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে ছিলেন সাহিত্য সমালোচক, ঐতিহাসিক এবং সমাজতত্ত্ববিদ মনীষী। কী গভীর দায়িত্ববোধ তাকে প্রাণিত করেছিল 'স্পেক্টেটর' পত্রিকার আদর্শে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার প্রকাশে এবং পত্রিকার প্রয়োজনে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায়-- তা এই প্রেক্ষিত-আলোচনায় স্বচ্ছ হয়ে হঠ। আমরা বুঝতে পারি অনলসকর্মা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাবন্ধিক সত্তার বৈশিষ্ট্য। তাই গুরুত্বহীন না প্রবন্ধ রচনার প্রেক্ষিত আলোচনা।

১.৫ অনুশীলনী

১।প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করো।

২।বিবিধ প্রবন্ধ সম্পর্কে যা জানো লেখ।

৩।বিবিধ প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য কি ছিল?

৪। বিবিধ প্রবন্ধের পাঠ্য প্রবন্ধগুলি রচনা প্রেক্ষিত আলোচনা করো।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত- বঙ্কিমচন্দ্র ১৯২০

অজরচন্দ্র সরকার -বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য -বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

অলোক রায় -প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ মন

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়- সমালোচনা রূপরেখা,বঙ্কিম পর্ব

একক ২ - প্রবন্ধ -উত্তরচরিত

বিন্যাসক্রম

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ তৃতীয় অঙ্কের গুরুত্ব

২.৩ আলোচনা

২.৪ লক্ষ্য

২.৫ বিষয়বস্তু

২.৬ প্রতিপাদন

২.৭ সমালোচনার দৃষ্টিকোণ

২.৮ অনুশীলনী

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

উত্তরচরিত বাংলা সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য সমালোচনা। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', এবং 'শকুন্তলা মিরান্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধ দুটিতে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু সে আলোচনা উত্তরচরিতের মতো বিস্তৃত আলোচনা নয়। তাছাড়া এই প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র শধু উত্তরচরিতের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করেননি, কাব্যগুণ

বলতে কি বোঝায়, কাব্যের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, অর্থাৎ সমালোচনা শাস্ত্রের মূল তত্ত্বটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

বর্তমান প্রবন্ধটিতে ভবভূতির কৃতিত্ব কোথায়, কোথায় তার সীমাবদ্ধতা তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থের উপাখ্যান বাল্মীকির রামায়ণ থেকে নেওয়া, কিন্তু কিছু কিছু অংশ ভবভূতির নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত। সেই অংশগুলির মধ্যে ভবভূতির মৌলিকতা কেমনভাবে ফুটে উঠেছে বঙ্কিম তা দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তুলনা করেছেন বাল্মীকির সঙ্গে এই তুলনা করতে গিয়ে বঙ্কিম যে মত প্রকাশ করেছেন তা হল-(১) রামায়ণের রাম রাজকুল অকীর্তির আশঙ্কায় সীতা বিসর্জন দেন, সেখানে ভবভূতির রাম প্রজা মনোরঞ্জনের জন্য সীতাকে বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। (২) রামায়ণের রাম ক্ষাত্র ধর্মে দীক্ষিত, মহাতেজস্বী, কিন্তু ভবভূতির রাম কোমল প্রকৃতির। বঙ্কিম অবশ্য এর জন্য কালগত প্রভাবকে দায়ী করেছেন। রামায়ণের কাল আর্যদের আধিপত্য বিস্তারের কাল, কিন্তু ভবভূতির কাল ভাোগ্যকাঙ্ক্ষার কাল। মানুষ তখন স্বভাবতই অলস ও কোমল প্রকৃতির হয়ে পড়েছিল। তারই প্রভাব পড়েছে রাম চরিত্রে। সেইজন্য আমরা দেখি পুর নরনারীদের অপবাদে বাল্মীকির রাম যখন সিংহের ন্যায় দুঃখে এবং ক্রোধে গর্জন করছেন তখন ভবভূতির রাম স্ত্রীলোকের মতো ক্রন্দনপরায়ণ হয়ে পড়েছেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিম সাহিত্যের নান্দনিক দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, (১) সাহিত্যকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত করে দেখলে হবে না তাকে সামগ্রিক ভাবে দেখতে হবে। (২) সৃষ্টিক্ষমতাই কবির প্রধান গুণ। সৃষ্টিক্ষমতা না থাকলে সার্থক কবি হওয়া যায় না। (৩) নীতিশিক্ষা কাব্যের উদ্দেশ্য নয়, সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের উদ্দেশ্য।

২.২ তৃতীয় অঙ্কের গুরুত্ব

সমগ্র উত্তরচরিত নাটকের মধ্যে তৃতীয় অঙ্কটি অতি মনোহর। এক কথা সত্য নাটকে action ই বড়। নাটকে ক্রিয়া পারম্পর্য না দেখালে সেই নাটক সার্থক হয় না। এই

নাটকের কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে সেই ক্রিয়া পারম্পর্যের একান্ত অভাব। কিন্তু এই অংশে কবি যে অপূর্ব কবিত্ব প্রকাশ করেছেন তাতে উক্ত দোষ একেবারে চাপা পড়ে যায়।

এই অঙ্কের বিস্তক অতি মধুর। গোদাবরীর সহিত মিলিতা তমসা ও সুরলা নামে দুটি নদী মানবী রূপ ধারণ করে রাম ও সীতা বিষয়ক কথা বলছে। দ্বাদশ বর্ষ পূর্বে রাম সীতাকে বিসর্জন দিয়েছেন। প্রথম বিরহে যে গুরুতর শোক উপস্থিত হয়েছিল সর্বসত্তাপহারী কাল সে শোক প্রশমিত করতে পারেনি। সেই সন্তাপে দগ্ধ হয়ে রাম রাজকার্য সম্পাদন করতেন। সেই পঞ্চবটী বনে রাম আবার এসেছেন। পদে পদে সীতার সঙ্গে বসবাসের চিহ্ন দেখছেন ।এই স্থানে কতকাল কত সুখে সীতার সঙ্গে কাটিয়েছেন, সে সকল কথা মনে পড়ছে। দ্বাদশ বৎসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ প্রবল বেগে উৎসাহিত হল। নদীগুলি দেখল আজ বড় বিপদ। তাই মুরলা গোদাবরীকে বলল গীতা শোকে রাম যদি মুছিত হয় তাহলে সে যেন তার শীতল জল দিয়ে রামের মুর্মা ভঙ্গ করে ত্রদল দেবতা ভাগিরথী শোক সন্যাপ থেকে রামকে রক্ষা করার জন্য সর্বসভাপহারিনী ছাড়া সেখানে পাঠালেন। সেই ছায়ার চরিত্র দেখে আজও আমরা মুগ্ধ হই। এই ছায়া চরিত্রটিকে অবলম্বন করেই তৃতীয় অঙ্কের নাম রেখেছেন ছায়া। এই ছায়া আসলে পাতালপ্রবিষ্টা তীর্ণদেহধারি হতভাগিনী সীতার ছায়া।

লব কুশ জন্মগ্রহণ করার পর ভাগিরথী এবং পৃথিবী বালক দুটিকে বাল্মীকির আশ্রমে বেজে দিলেন এবং সীতাকে রেখে এলেন পাতালে। কুশ ও লবের জন্মদিন উপলক্ষে পতিকুল্যাদিপুরুষ সূর্যদেবকে স্বহস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করার জন্য ভাগিরথী সীতাকে সেই জনস্থানে পাঠালেন। আপন দৈব শক্তির প্রভাবে সীতাকে অদৃশ্য রাখলেন। ছায়ারূপিণী সীতাকে সকলে দেখতে পেলেন আসল সীতাকে কেউ দেখতে পেলেন না।

সীতা জানতেন না যে রাম সেই স্থানে এসেছেন। সীতা সেই স্থানে প্রবেশ করলেন। সেই জনস্থানের প্রতি তার কী গভীর আকর্ষণ । পূর্বসুখের স্থান দেখে সবই মনে পড়ল। তার স্মরণ হল এই স্থানে তিনি যখন রামের সঙ্গে থাকতেন তখন বনদেবী বাসন্তীর সঙ্গে তার সখী হয়েছিল। তখন সীতার একটি করিশাবক ছিল। সে যখন

জলপানে রত তখন এক মত্ত যুথপতি তাকে আক্রমণ করল। সীতা তা দেখেননি, কিন্তু বাসন্তী দেখতে পেয়েছিল, সে চীৎকার করে বলল যে, সীতার পালিত করিশাবককে মেরে ফেলল। সেই চীৎকার সীতার কর্ণে গেল। সেই। জনস্থান, সেই পঞ্চবটী, সেই বাসন্তী, সেই করিশাবক। সীতার ভ্রান্তি জন্মাল। সে করিশাবকের বিপদে বিহ্বল হয়ে হঠাৎ চীৎকার করে বলল "কোথায় আর্যপুত্র, আমার পুত্রকে বাঁচাও।" কী বিরাট ভ্রম। আজ বার বৎসর যে আর্যপুত্রের দেখা নেই সেই আর্যপুত্রকে হঠাৎ মনে পড়ল ।এদিকে রামচন্দ্র লোপামুদ্রার আহ্বানে অগস্ত্য আশ্রমে গমন করছিলেন। পঞ্চবটী বনে বিচরণ করার জন্য তিনি সেখানে বিমান রাখতে বললেন। রামের সেই কণ্ঠস্বর সীতার কর্ণে প্রবেশ করল। সীতার মূচ্ছাভজা হল। ভয়ে আহ্লাদে সীতা উঠে বসল। তমসা তাকে আসল কথা লুকাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সীতা তাকে বলল যে, সে আর্যপুত্রের কণ্ঠস্বর শুনেছে। সেই কণ্ঠস্বর তার পক্ষে ভোলা অসম্ভব। তখন তমসা বুঝল সীতার কাছে আসল সত্য লুকানো বৃথা। তাই জানাল মহারাজ রামচন্দ্র কোনও এক। শুদ্র তাপসকে দণ্ড দেবার জন্য এই স্থানে আগমন করেছেন। এ কথা শুনে সীতা বিচলিত হলেন । বার বৎসর পরে প্রাণের অধিক প্রিয় স্বামী নিকটে, তবু তিনি উতলা হলেন না। শুধু বললেন "সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম পালনে ত্রুটি হইতেছে না।"

বঙ্কিম বলেছেন, এ অংশ অনির্বচনীয়। যে-কোনও ভাষায় যে-কোনও নাটকে যে শ্রেষ্ঠাংশ আছে তার সঙ্গে এর সৌন্দর্য তুলনীয়। যাই হোক দুর থেকে রামের বিরহ ক্রিষ্ট আকার দেখে তমসাকে ধরে সীতা মাটিতে বসে পড়ল। এদিকে রামও বিরহ 'অনলে পুড়তে পুড়তে সীতা সীতা বলে মূচ্ছিত হয়ে পড়ল। তখন তমসার পরামর্শে সীতা রামকে স্পর্শ করল। রাম চেতনা প্রাপ্ত হল।

সেই সময় সীতার সখী বনদেবতা বাসন্তী সীতার করিশাবকের অন্বেষণে সেই স্থানে। উপস্থিত হলেন। রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় রাম করিশিকে রক্ষার জনা গেলেন। ইতিমধ্যে এই করিশিশু শত্রু জয় করিনীর সঙ্গে ক্রীড়া করছিল। সেই করিশাবককে দেখে সীতার আপন কানদ্বয়ের কথা মনে পড়ল। পুত্র দর্শনে বর্ণিত সীতার-বেদনা অপরূপ ভঙ্গীতে প্রকাশ পেল।

সেই গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বনে বাসন্তীর অনুরোধে রাম উপবেশন করলেন। বাসন্তী সীতা সম্পর্কে নানা কথা বলার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেমন করে তিনি সীতাকে বিসর্জন দিলেন। রামকে নিষ্ঠুর সম্বোধন করে তিনি বললেন যে, যশই তোমার একান্ত প্রিয়, সীতা নয়। যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্তী হয়ে রাম এই হীন কাজ করেছেন।

বঙ্কিম মত প্রকাশ করেছেন এই কথোপকথনের যথোচিত প্রশংসা করা দুঃসাধ্য। সীতা বিসর্জনের জন্য বাসন্তী রামের প্রতি ক্রোধযুক্ত হয়েছিলেন। বাসন্তীর বাক্যে রামের শোকসাগর উচ্ছলিত হয়ে উঠল।

ছায়ারূপিণী সীতা তমসার সঙ্গে সব সময়ে নিকটেই ছিলেন। বাসন্তী রামকে যন্ত্রণা দিচ্ছে দেখে বারবার তাকে তিরস্কার করছিলেন। কতবার রামের রোদন শুনে মর্মপীড়িত হচ্ছিলেন। সীতা রামচন্দ্রের দুঃখের কারণ হচ্ছে দেখে বহুবার কাতরোক্তি করেছেন, আবার রামচন্দ্র মূর্হিত হলে সীতা ক্রন্দন করেছেন, মূর্ছিতপ্রায় হয়েছেন। তমসা এবং বাসন্তী তাকে ওঠালেন। তখন তিনি সসম্ভ্রমে রামের ললাট স্পর্শ করে অপূর্ব সুখ অনুভব করলেন। রামচন্দ্রও সীতার স্পর্শসুখে আহ্লাদিত হয়ে বাসন্তীকে বললেন আজ তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন । তিনি সীতাকে আজ পেয়েছেন। বাসন্তী যখন তাকে বললেন যে তিনি প্রলাপ বকছেন তখন রামচন্দ্র বললেন বিবাহকালে যে বৈবাহিক মঙ্গলসূত্রযুক্ত হাত তিনি ধারণ করেছিলেন সেই হাতকে তিনি চিনতে পেরেছেন। এই কথা বলে রাম তার ললাটথ অদৃশ্য সীতার হস্তকে ধারণ করলেন। তখন সীতা দেখলেন স্পর্শমোহে প্রমাদ ঘটল। রাম সীতার হাত ধরে রাখতে পারলেন না। আনন্দে তার ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হয়ে পড়ল। তখন রাম বাসন্তীকে আর হাত ধরতে বললেন। সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়িয়ে নিলেন। রাম জানতে পারলেন সীতা নেই। তখন রাম আবার বিলাপ করতে লাগলেন। রোদন ক্রমে শান্ত হলে তিনি বাসন্তীকে বললেন এবার এ স্থান তিনি পরিত্যাগ করবেন। তখন সীতা উদ্বেগের সঙ্গে বললেন যে আর্যপুত্র *চলে* যাচ্ছেন। তমসা সীতাকে বললেন যে চল আমরাও যাই। তখন সীতা ক্ষণকালের জন্য আর একবার রামকে দেখতে চাইলেন। রাম চলে যাচ্ছেন দেখে সীতা করজোড়ে

তাকে প্রণাম করতে করতে মুছিত হয়ে পড়লেন। তমসা তাকে আশ্বস্ত করলেন। সীতা তখন বললেন "আমার এ মেঘান্তরে ক্ষণকালের জন্য পূর্ণিমাচন্দ্র দেখামাত্র।"

তৃতীয় অঙ্কের সারমর্ম এটাই। এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। প্রথমতঃ, এটি নাটকের পক্ষে অনাবশ্যক। নাটকের যা *বিষয়বস্তু* রাম ও সীতার পুনর্মিলন তার সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হলে নাটকের কোনও হানি হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ একটি সুদীর্ঘ অঙ্ক নাটক মধ্যে সন্নিবেশিত হলে রস *ভঙ্গের* কারণ হয়। তৃতীয়ত, এই অংশে পুনঃপুনঃ রীমের বিলাপ অসহ্য। এতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। তবু একথা উচ্চকণ্ঠে বলা যায় যে, অন্যান্য নটিক একেবারে বিলুপ্ত হয় তাও স্বীকার তথাপি উত্তরচরিত্রের এই তৃতীয় অঙ্ক ত্যাগ করা যায়ন।কারণ কাব্যাংশের দিক দিয়ে এর তুল্য রচনা দুর্লভ।

২.৩ আলোচনা

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সম্পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য সমালোচনার নাম উত্তরচরিত। এই সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ থেকে বাঙালি পাঠকের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। সমালোচনাশাস্ত্রের সূচনালগ্নে বাঙালি লেখকদের কাছে উন্নত সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে সংস্কৃত সাহিত্যই ছিল একমাত্র উদাহরণ। নব্যরুচির নব সাজের আধুনিক সাহিত্য তখন সবে সূজ্যমান। এমনই এক সমাজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যের কবি ও নাট্যকারদের মধ্য অনেককে সামনে রেখে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ও মূল্যায়নে ব্রতী হন। ওই উদ্যোগগুলিকে সমালোচনা কণিকা বলাই অধিক সঙ্গত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিত'-কে এই ধারার সম্পূর্ণাঙ্গ সর্বার্থসাধক দৃষ্টান্ত বলা যায়। বমি তাঁর স্বল্প পরিসরের (সংখ্যায় বেশ কম) সাহিত্য সমালোচনায় তিনজন প্রধান সংস্কৃত কবি-নাট্যকারের মুখোমুখি হয়েছেন মহাকবি বাল্মীকি, কবি ও নাট্যকার কালিদাস এবং নাট্যকার ভবভূতি। এঁদের মধ্যে ভবভূতি 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে এবং কালিদাস শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমা◌োনা'

প্রবন্ধে প্রধানত আদ্যন্ত চর্চিত হয়েছেন। বাল্মীকি প্রসঙ্গ এসেছে। ভবভূতি স্ফুটনের তুলনীয় সহায়ক হিসাবে। মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রও অবশ্য দুই ভিন্ন প্রস্তাবে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেখানে মহাভারতকারের আড়ালে ব্যাসদেব প্রসঙ্গ পরোক্ষভাবে আভাসিত হতে দেখেছি আমরা। এই চিত্র থেকে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে কালিদাস ও ভবভূতির সঙ্গে তার মানসিক সাযুজ্যতা ও অভিনিবেশের একটা স্পষ্ট লক্ষণ ধরা পড়ে।

২.৪ লক্ষ্য

ক) উত্তররামচরিত নাটকের গঠন বিন্যাসের অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা।

খ) রামচরিত্র ফুটনে ভবভূতির কৃতিত্ব ও সীমাবদ্ধতার আলোচনা,
প্রসঙ্গক্রমেই বাল্মীকিকে বারবার প্রতিতুলনায় টেনে আনা।

গ) আনুবীক্ষণিক বিচারে নিরস্ত না হয়ে মূল প্রবন্ধ কাঠামোর শেষ
একতৃতীয়াংশে আধুনিক রোমান্টিক পদ্ধতি অনুসারে গ্রন্থ-সমালোচনার অপর এক মার্গ প্রদর্শন।

ঘ) গ, অংশের প্রবর্তনা সূত্রে বাংলা সাহিত্যে অনালোচিত নান্দনিক সূত্রের প্রস্তাবনা এবং এ বিষয়ে উত্তরাধিকারীদের উৎসাহিত করে তোলা।

২.৫ বিষয়বস্তু

প্রথমে কাঠামোর কথা বলা যাক। দীর্ঘায়ত প্রবন্ধটি সাধারণ পুস্তক পরিমাপে প্রায় পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। নাটকটির অভ্যন্তরীণ আলোচনাকে এই ছকে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথমাঙ্ক সর্বাধিক উদ্যমে আলোচিত তৃতীয়াজ-পত্র সংখ্যানুযায়ী প্রথমার্কের মাপের অর্ধেক থেকে কিছু বেশি, দ্বিতীয়াকের আলোচনা সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত,

প্রায় বাকি অঙ্কগুলির সংক্ষিপ্ত মিলিত আলোচনার আয়তন তৃতীয়ারে কাছাকাছি।

এই পর্যন্ত প্রবন্ধটির প্রথম আবর্ত। নবোদ্যমে আর এক আবর্ত সূচিত হয়েছে সমালোচনার অন্য এক পন্থার নিরিখে। তার আয়তন তৃতীয়ার্কের আলোচনার মতোই। পরিসংখ্যান থেকে প্রমাণিত, প্রবন্ধের প্রথম উদ্যম মূল অবয়বের দুই তৃতীয়াংশ দখল করেছে। বাকি এক তৃতীয়াংশ দ্বিতীয় আবর্তের আওতায় পড়েছে।

আলোচনার সূত্রপাতেই বঙ্কিম বলে রেখেছেন, উত্তরচরিত্রের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত । সুতরাং তাকে দেখাতে হয়েছে মূল বৃত্তান্তের তুলনায় কোন্ কোন্ অংশ ভবভূতির নিজস্ব সংযোজন। স্বকলোপকল্পনার ওইসব স্বাধীন অংশেই ভৰভূতির মৌলিকতা দর্শনের সুযোগ। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহক কবি, পূর্বজন থেকে ক্ষমতাবান হলে এক অবস্থা, আর কম ক্ষমতার মানুষ হলে অন্য অবস্থা। বমি এখানে শেক্সপিয়র প্রসঙ্গ এনে দেখিয়েছেন, শেক্সপিয়র উৎসের কবির চেয়ে বেশি আত্মনির্ভরশীল ছিলেন জেনেই পূর্বসূরীদের অনুগমনে অকুতোভয় ছিলেন, কিন্তু ভবভূতিকে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র নির্ধারণে বাল্মীকির ক্ষমতার কথা আগে অনুধাবন করতে হয়েছে। | এর পর বঙ্কিমের অকওয়ারি সফর শুরু হয়েছে। নাটকের প্রথম অঙ্কে পূর্বজীবনের স্মৃতি অধ্যুষিত চিত্রদর্শনের (সীতা কর্তৃক) সাড়ম্বর বর্ণনা আছে। নাটক বিচারের নিয়ম মেনেই বমি ওই দৃশ্যের নাট্যোপোযগিতার কথা তুলেছেন। তাঁর মতে রাম-সীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণনা করাই ইহার উদ্দেশ্য। এবং তৃতীয়াঙ্কে সীতার্জন জনিত শোকের (রামচন্দ্রের) তীব্রতা অনুভব করানোর জন্যই এই দৃশ্যের প্রস্তাবনা। অঙ্ক নিরূপিত দৃশ্যের বর্ণনাসূত্র রাম-সীতা ও লক্ষ্মণের চিত্র প্রতিক্রিয়াকে সযত্নে ব্যাখ্যা করার পর বঙ্কিম আচম্বিতেই ভবভূতি ও কালিদাসের বর্ণনাশক্তির মধ্যে তুলনার অবতারণা করেছেন। বলা হয়েছে, কালিদাসের বর্ণনা সর্বদা উপমায় মনাোহারিণী। ভবভূতি তুলনায় বিরল উপমায় বর্ণনার স্বাভাবিকতা রক্ষা করেন। তার বর্ণনার ক্রিয়াত্মক গুণই প্রধান। সৌন্দর্যাবতারণার প্রধান লক্ষ্য হেতু কালিদাস সর্বরসে বিশারদ

নন। সেখানে কম বর্ণনা সত্বেও ভবভূতির মধ্যে সর্বরসে বিচরণের সুযোগ বেশি। বিষয়টিকে আরো বিশেষায়িত করার জন্য বঙ্কিম বলেছেন—"মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।"

রামায়ণের সতো উত্তরচরিতের প্রসঙ্গ ভিত্তিক তুলনায় বঙ্কিমের অভিমত ছিল এই রকম—

ক) রামায়ণের রাম রাজকুল অকীর্তির আশঙ্কায় সীতা বিসর্জন দেন। সেখানে ভবভূতি প্রজারঞ্জন অকর্তব্য বিবেচনায় প্রজাদের দাবিমতে সীতা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন।

খ) রামায়ণের রামচন্দ্রের তুলনায় ভবভূতির নায়ক "অধিকতর কোমল প্রকৃতির।"

কারণ হিসাবে বঙ্কিম কিন্তু কালকেই প্রধানত দায়ী করেছেন। ভবভূতির কালে ভারতবর্ষীয়রা ভোগাকাঙ্কা ও অলসাদির কারণে কোমল স্বভাব বিশিষ্ট হয়ে পড়েছিল। তাই তাঁর রামচন্দ্রে 'গাম্ভীর্য এবং ধৈর্য্যের বিশেষ প্রভাব। এ প্রসঙ্গে বমিচন্দ্রের মন্তব্যে বেশ নির্দয়তার ছাপ রয়েছে। রামায়ণের রাম ক্ষত্রিয়, ...মহাতেজস্বী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, হৃদ্দিদ্ধ সিংহের ন্যায় রোষে দুঃখে গর্জন করিয়া উঠিলেন। ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্তে স্ত্রীলোকের মতো পা ছড়াইয়া কাদিতে বসিলেন। রামচন্দ্রের কান্না নিয়ে সীতার বনবাস' রচয়িতা বিদ্যাসাগরকেও একহাত নিতে বঙ্কিম ছাড়েননি। উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কের 'রামবিলাস মনোহর নহে।' এটাই বঙ্কিমের এ প্রসঙ্গের রায়।

দ্বিতীয়াঙ্ক এবং তৃতীয়াঙ্ক সম্বন্ধে বঙ্কিমের নাট্যসম্মত বিচারের আর একটি সূত্র হল

উত্তরচরিতের একটি দোষ এই যে, নাটকবর্ণিত ক্রিয়াসকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই।

এবং আরও একটি বিকল্প সিদ্ধান্ত

যেমন প্রথমাজের পূর্বে প্রস্তাবনা, সেই রূপ অন্যান্য অঙ্কের পূর্বে একটি একটি বিস্তৃক আছে। এগুলি অতি মনোহর।

তৃতীয়াকের সমালোচনায় এই অংশের কাব্যগুণে বঙ্কিম একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ। এই অধ্যায়ে ছায়াসীতার অপূর্ব পরিকল্পনা করেছেন ভবভূতি। লবকুশের জন্মতিথি উপলক্ষে পুষ্পচয়নের জন্য ছায়ারূপিনী সীতা জনস্থানে এসেছেন। রামচন্দ্র ও স্মৃতি সন্তাপের তাড়নায় জনখানে হাজির। স্মৃতি সন্তাপে মশগল সীতা লক্ষ্য করেননি তার পালিত করিশাবককে এক মত্তমাতঙ্গ আক্রমণ করে বসেছে। আকস্মিক দুর্ঘটনার চাপে সীতা হতচেতন হলেন। পরে ভ্রমণরত রামচন্দ্রের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র তার চেতনা ফিরে এলো। অনুরুপ এক ঘটনায় বাসন্তীর সঙ্গে আলাপচারিতায়। সীতা বর্জন জনিত তীব্র শোকাঘাতে রাম মূর্হিত হলেন। পরে ছায়াসীতার শুশ্রষায় তার করস্পর্শের অনুভব পেয়ে রামের চেতনাপ্রাপ্তি হল। রাম-সীতার এই নিয়মরক্ষার অদৃশ্য মিলন পরিকল্পনায় এককথায় বঙ্কিমচন্দ্র অভিভূত।

বিহ্বল ভাবের দরুন বঙ্কিমের বিচারও আবেগ বিচলিত হয়ে পড়েছে। তৃতীয়াঙ্কের নাট্যসূত্র ছিন্ন হওয়ার জন্য বকিম যারপরনাই বিরক্ত। কিন্তু কাব্যাংশের বন্দনায় তিনি স্বতঃস্ফুর্ত।

কিন্তু সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, অন্য অনেক নাটক একেবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্ত্তব্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।

বাকি তিন অঙ্কের উৎকর্ষ বিচারের পরে বঙ্কিম সমালোচনার দ্বিতীয় আবর্তে পৌঁছেছেন।এই দ্বিতীয় আবর্তটি কাব্যতত্ত্বের আলোচনা, যার ভিত্তিতে প্রথম স্তরের চুলচেরা নাটিক বিশ্লেষণের পরে বঙ্কিম সামগ্রিকভাবে গ্রন্থের মূল্যায়নে উদ্যোগী হবেন।

দ্বিতীয় আবর্তের গোড়ায় বঙ্কিম প্রকৃতি সমালোচনার পথ বদলাতে *চেয়েছেন*। গ্রন্থদেহকে প্রয়োজনে খণ্ড খণ্ড করে নিয়ে প্রতি খণ্ডের পৃথক পৃথক বিশ্লেষণে সমগ্র সৃষ্টির গুণাগুণ বিচার হয় না এটাই বঙ্কিমের অভিমত। তাজমহলের অপূর্ব অনুধাবন করতে প্রতিটি পাথরের নকশাকে বিশ্লেষণ করাই শেষ কথা নয়। দূর থেকে সমগ্র তাজমহলের অনবদ্যতাকে মনশ্চক্ষে ধরা চাই। সুতরাং কাব্য-নাটকের সৌন্দর্য বোঝার

জন্য তার ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ত্রুটি বা প্রশংসার মুহূর্তগুলিকে পরিণামী মূল্যায়নের জন্য সরিয়ে রাখা প্রয়োজন। এই সংশ্লেষণী রোমান্টিক পন্থার জন্য কিছু নান্দনিকতার অনুশীলন করা দরকার।

সূত্র ১, সৃষ্টিক্ষমতাই কবির প্রধান গুণ। খণ্ড খণ্ড কৃতিত্বের কারণে সৃষ্টিক্ষমতার প্রকাশ ঘটে না। সৃষ্টিক্ষমতা আভ্যন্তর সমন্বয়ের এক সামগ্রিক ব্যাপার। গোলাপের বর্ণ গুণ বা পাপড়ির গঠন বৈচিত্র্যেই গোলাপ সুন্দর নয়। সব মিলিয়ে গোলাপের মধ্যে সুসামঞ্জস্যের যে ব্যবস্থা তাই গোলাপকে সুন্দর করে তোলে।

সূত্র ২, কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্য্যাবিশিষ্ট না হইলে, কোনো প্রশংসা নাই। প্রথম শর্তটির পূরণ হওয়ার পর উত্তর অতিক্রম করতে পারলে তবেই দ্বিতীয় ধাপে পৌছানো যায়। সৃষ্টিমাত্রের স্বভাবানুযায়ী হওয়া প্রথম দায়। জীবন ও জগতের সহজাত ধর্মকে কবি প্রথমে রক্ষা করার কথা ভাবেন। জাগতিক সত্যের এই মান্যতা থেকেই সাহিত্যসত্য উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তখন স্বভাবানুকরণকে অতিক্রম করার সামর্থ্য তৈরি করতে হয় সৃষ্টির মধ্যে। স্বভাবাতিরিক্ত সত্যকে ধরতে পারলেই পাঠকের চিত্ত রঞ্জনের ব্যবস্থা হয়। সৃষ্টি রস পায় এই অংশেই।

সূত্র ৩, পাঠকের চিত্তরঞ্জন কোনো খেলো কাজ নয়। জাগতিক কল্যাণ ও নীতিশিক্ষার সঙ্গে তা সম্পৃক্ত। 'নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য।' তবে কবির ক্ষেত্রে এর প্রয়োগপদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। তাহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সুজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।

এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই তিনটি নান্দনিক সত্যের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্রত ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকের মূল্যায়ন করেছেন। এই পন্থা অবলম্বনের দ্বারা তিনি এও বুঝিয়েছেন, এর genre ধরে নাট্যভিত্তিক আলোচনাই শেষ কথা নয়। প্রতি genre-এর আধারে। সর্বজনীন সাহিত্যরস ধরা থাকে। তার উদ্ঘাটনই সমালোচকের কাজ এই সূত্রসাধনে। বঙ্কিমের findings-গুলি প্রতিপাদ্যতা অংশে আলাদা ভাবে বিন্যস্ত হল।

২.৬ প্রতিপাদন

ক. উত্তররামচরিত রাম-সীতা চরিত্র ত্রুটিমুক্ত নয়। সীতা রামায়ণেরই প্রতিকূল আর রাম চরিত্রে ভবভূতি রামায়ণী ভাবমহিমাকে ধরে রাখতে পারেননি। তবে অপ্রধান চরিত্রগুলি সুন্দর হয়েছে। যেমন, বাসন্তী, তমসা, গঙ্গা, পৃথিবী, চন্দ্রকেতু এবং লব চরিত্র। ছায়ারূপিনী সীতার মুহূর্তির্ক সৃষ্টি অনবদ্য। চরিত্র সৃজনে ভবভূতির কৃতিত্বকে বঙ্কিম মধ্যমানের বলেই মনে করেন।

খ. "রসোর্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম । মানবচিত্তবৃত্তির বৈচিত্র প্রদর্শনে ভবভূতির দক্ষতা পৃথিবীর যে-কোনো স্রষ্টার সমতুল, এটাই বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত।

গ. বাহাপ্রকৃতির শোভাবর্ণনাতেও ভবভূতি অদ্বিতীয়। আরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে রাম-সীতার সংলিপ্ততার মুহূর্তগুলিকে প্রথমাঙ্ক ও তৃতীয়াকে তিনি অনন্যতা দিয়েছেন। তমসা ও গঙ্গা নদীর মানবীরূপ কল্পনাকেও তিনি অনবদ্য করে তুলেছেন।

ঘ. সমাসবহুলতা সত্বেও ভবভূতির ভাষাকে 'চমৎকারিণী' বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর ভাষায় ক্রিয়াত্মকতা ও ওজস্কিতাগুণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

২.৭ সমালোচনার দৃষ্টিকোণ

১. সমালোচনাটি আদর্শ গ্রন্থ সমালোচনার নিদর্শন। একদেদর্শিতার পথ না ধরে দুটি পৃথক উপায় বা পদ্ধতির সমন্বয় ও সেতুবন্ধন করা হয়েছে প্রবন্ধটিতে। একদিকে analysis বা বিশ্লেষণ ও judgement বা বিচার পদ্ধতি, অন্যদিকে রসোপভোগ বা appreciation এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় বা synthesis করা হয়েছে।
পরীক্ষামূলকভাবে দুটি উপায় জুড়ে একটা মূল্যায়নে পৌছানোর প্রয়াস বলা যায় প্রবন্ধটিকে। Genre ভিত্তিতে বলা যায় Classical এবং Romantic পদ্ধতির সংযোগসাধন।

২. পৃথক ভাবে প্রথম প্রয়াসটি (আনুবীক্ষণিক সমালোচনার বেলায়) সমালোচকের অনুসরণযোগ্য আদর্শের দিক থেকে শিক্ষণীয়। দোষ-গুণ নির্ণয় করতে গিয়ে বঙ্কিম একটা অপক্ষপাত ভারসাম্যের মান প্রস্তুত করেছেন, যাকে আমরা মডেল বলে ধরতে পারি। অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পাশে প্রথমাঙ্ক ও তৃতীয়াঙ্ক সম্বন্ধে অনেকগুলি সরাসরি judgement-এর কথা আছে প্রবন্ধটিতে। যেমন,

বিচার ক, মূল রামায়ণগীতে রামচন্দ্র চরিত্রে কিছু কিছু গুণাতিরেক দোষ আছে।

বিচার খ, উত্তরচরিতের প্রথমারে রামবিলাপ সুন্দর নয়।

বিচার গ, উত্তর চরিত নাটকবর্ণিত ক্রিয়ায় কালগত নৈকট্যের অভাব।

বিচার ঘ, নাটকের প্রতি অঙ্কের বিস্কন্তকগুলি মনোহর।

বিচার ঙ, ক্রিয়াপারম্পর্যহীনতার দোষে তৃতীয়াঙ্ক সর্বাদিক দোষে দুষ্ট।

বিবিধ প্রবন্ধ : বঙ্কিমচন্দ্র

৩, বিচার বা judgement থাকলেও কোথাও অসহিষ্ণুতা নেই। বরং নিরপেক্ষ বিচারের স্বার্থেই অন্যদিকেও দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। এ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে ভারসাম্যের সূত্রটি। উত্তরচরিতের তৃতীয়াঙ্ক নাট্য বিষয়ে দুর্বল, কিন্তু ওই তৃতীয়াঙ্কই আবার কাব্য বিচারের দিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট। এখান থেকেই আমরা আদর্শ সমালোচনার গুণবত্তার প্রমাণ পাই। অহংকৃত বিচারে অনড় না থেকে সম্ভাব্য নমনীয়তার অন্য পথ সন্ধান করা কর্তব্য।

৪, নাটকবিচারের বিষয়টিকে genre ভিত্তিক সীমাবদ্ধতা থেকে বার করে এনে সর্বজনীন শিল্পমানে উদ্ভাসিত করে তোলার একটি পথরেখা প্রদর্শন করছে এই প্রবন্ধ।

৫, মগ্ন সমালোচনা অনেক সময় সর্বগ্রাহ্য শিল্পসূত্রের support বা অনুমোদন নেয়। বর্তমান প্রবন্ধেও প্রকৃত সমালোচনার স্বার্থে একাধিক শিল্পতন্ত্রের কথা আনা হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নান্দনিক আলোচনার একটা সূত্রপাত হল

বলা যায়। বঙ্কিম নন্দনশাস্ত্রে অভিনিবেশ নিয়ে এ বিষয়ে একটিও পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচনা করেননি। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়কে প্রবন্ধে অনেক নান্দনিক সূত্র বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। উত্তরচরিত সর্বাধিক সংখ্যক সূত্রকে একসঙ্গে ধারণ করেছে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

২.৮ অনুশীলনী

১। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিত অবলম্বনে ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকটি বিশ্লেষণ করো।

২। 'উত্তরচরিত' এ বঙ্কিমচন্দ্র বাল্মিকী ও ভবভূতির নির্মিত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং তার কারণ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো।

৩। উত্তরচরিত অবলম্বনে ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক আলোচনা করো।

৪। সাহিত্যতত্ত্ব ভিত্তিক বাংলা প্রবন্ধের অগ্রদূত এই প্রবন্ধটি- মন্তব্যটির চিত্র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ হিসেবে উত্তর চরিতের বিশেষত্ব আলোচনা করো।

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত- বঙ্কিমচন্দ্র ১৯২০

অজরচন্দ্র সরকার -বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য -বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

অলোক রায় -প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ মন

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়- সমালোচনা রূপরেখা,বঙ্কিম পর্ব

মন্তব্য

প্রমথনাথ বিশী- সাহিত্যচিন্তা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একক ৩ - বিদ্যাপতি ও জয়দেব এবং শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেসদিমোনা

বিন্যাসক্রম

৩.১ বিদ্যাপতি ও জয়দেব

৩.২ লক্ষ্য

৩.৩ বিষয়বস্তু

৩.৪ প্রতিপাদন

৩.৫ সমালোচনার দৃষ্টিকোণ

৩.৬ কিছু অপূর্ণতার কথা

৩.৭ শকুন্তলা মিরান্দা দেসদিমোনা

৩.৮ বৈসাদৃশ্য

৩.৯ তুলনীয়

৩.১০ লক্ষ্য

৩.১১ বিষয়বস্তু

৩.১২ তৃতীয় প্রস্তাবেই আসল বক্তব্য

৩.১৩ প্রতিপাদন

মন্তব্য

৩.১৪ সমালোচনার দৃষ্টিকোণ

৩.১৫ অনুশীলনী

৩.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ বিদ্যাপতি ও জয়দেব

বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র রস-সাহিত্যের একজন সুনিপুণ শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন একজন বিশিষ্ট বন্ধিক। তিনি তার বিভিন্ন প্রবন্ধে সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য সর্ববিষয়েই তার মতামত যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী পথিকৃৎ। তিনি কখনো পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে এদেশের সাহিত্যের কখনো বা এদেশেরই প্রসিদ্ধ বিভিন্ন কবিদের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রথমটির উজ্জ্বল উদাহরণ শকুন্তলা মিরান্দা এবং দেসদিমোনা এবং দ্বিতীয়টির উদাহরণ 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব।'

"বিদ্যাপতি ও জয়দেব" প্রবন্ধটিতে তিনটি বিষয়ের মধ্যে বঙ্কিম তার আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন। বিষয়গুলি হল—১) কেন ও কীভাবে বাংলাদেশে গীতিকবিতার উদ্ভব হল। তার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা, (২) বাঙালী গীতিকবিদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের স্বরূপ নির্ণয় করা, (৩) বিদ্যাপতি ও জয়দেবের কবি মানসিকতার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।

বঙ্কিম ছিলেন যুক্তিবাদে বিশ্বাসী। প্রাকৃতিক ঘটনা যেমন কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ থাকে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই কার্যকারণ সূত্রে বঙ্কিম বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলেছেন সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ নিয়ম অনুসারে বিশেষ বিশেষ ফল হয়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, জল যেমন কতকগুলি অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অধীন হয়ে কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টি, কোথাও শিশির, কোথাও বা বরফে

পরিণত হয় তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে দেশের অবস্থাভেদে অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হয়ে রূপান্তরিত হয়। এই সমস্ত নিয়ম অত্যন্ত জটিল এবং দুয়ে। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন সাহিত্য সম্বন্ধে সেই ধরনের তত্ত্ব এখনও পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারেননি। তবে একথা বলা যেতে পারে সাহিত্য সমাজের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়ম অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজ বিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই কারণেই ঘটে। আধুনিক কোনো কোনো ইউরোপীয় গ্রন্থাকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে হিতবাদের সমর্থক বকল বিশেষভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মূলতঃ সমাজতত্ত্বের আলোচনাতেই মত্ত হয়েছিলেন কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে তার যোগ অল্পই। বিদেশে কিছু কিছু আলোচনা হলেও আমাদের দেশে এই সব তত্ত্ব আলোচনায় কেউ ব্রতী হননি।

এরপর বঙ্কিম সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতীয় সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বিচার করেছেন। প্রথমেই তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন সেই প্রাচীন যুগে যখন আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে অনার্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল এবং তাদের পরাজিত করে দূর প্রান্তবাসী করে দিল। আর্যরা বীরের জাত, তারা ভয়শূন্য, তারা অনার্যদমনকারী, তারা বিজয়ী। তার মতে এই সময়কার ফসল হল রামায়ণ । এরপর ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষ যখন আর্যদের করায়ত্ত হল, যখন তারা বিপুল সম্পদের অধিকারী হল, যখন তাদের শত্রুভয় চিরতরে দূর হল তখন তারা আভ্যন্তরীণ বিবাদে লিপ্ত হল। যে বিপুল সম্পদ হস্তগত হয়েছিল তা কে ভোগ করবে তা নিয়েই বিবাদের সূত্রপাত হল। সেই সময় তাদের পৌরুষ চরমে পৌছেছিল, অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ তারা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিল। সেই সময়ের কাব্য হল মহা বহু যুথ, বহু রক্তপাতের পর আবার শান্তি ফিরে এল। আর্যরা সুখে দিন অতিবাহিত করতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি, ধর্মবৃদ্ধি বহুগুণে বর্ধিত হল। রোম, চীন, যবদ্বীপ পর্যন্ত ভারতের বানিজ্য হল। প্রতি নদীকূলে বড় বড় নগরী গড়ে উঠল। ভারতবর্ষের *লো*কেরা সুখী হল কতীত সুখ ও কৃতিত্বের ফল হল ভক্তিশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্র। কিন্তু এই ভক্তি ও

দর্শনশাস্ত্রের প্রাবলে ভারতবর্ষ ধর্মশৃঙ্খল এমনভাবে আবদ্ধ হল যে সাহিত্যও তার বশীভূত হল। তা ধর্মানুসারী হয়ে শুধু তাই নয়, বিচারশক্তিও ধর্মমোহে বিকৃত হল, প্রকৃত ও অপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হল। তখন ধতৃত্মা এত প্রবল হয়েছিল যে ধর্মই তখন প্রধান আলোচ্য বিষয় হল। ধর্মই সাহিত্যের বিষয়, হল।এই ধর্মমোহের ফল হল পুরাণ।কিন্তু এই ধর্মস্রোতের পাশাপাশি আবার বিলাসিতার শ্রেতি ও প্রবাহিত হয়েছিল। তার ফল হল কালিদাসের কাব্য ও নাটক।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশে গীতিকাব্যের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, আর্যরা সমগ্র ভারতবর্ষে আপন আধিপত্য বিস্তার করতে করতে এমন একটা প্রদেশে উপস্থিত হয়েছিল যেখানকার জলবায়ুর গুণে তাদের স্বভাব তেজ লুপ্ত হয়ে গেল। প্রদেশটির নাম বঙ্গদেশ। বঙ্গদেশের ভূমি নিম্ন এবং উর্বরা । সহজেই সেখানে প্রচুর ফসল ফলে। আর্যতেজ এখানে এসে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আর্য প্রকৃতি কোমল আলস্যপ্রিয় এবং গৃহসুখ অভিলাষী হল। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস নিশ্চেষ্ট গৃহসুখ পরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র কাব্যসৃষ্টি হল। যে কাব্যের নাম গীতিকাব্য। অন্য সব ধরনের সাহিত্যকে পিছনে ফেলে গীতিকাব্য সাত আট। শত বৎসর ধরে বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের রূপ নিয়েছিল। সেইজন্য বঙ্গদেশে গীতিকাব্যের এত আদর। বাদেশের গীতি-কবিদের বমি দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। একদল প্রাকৃতিক শোভার। মধ্যে মানুষকে স্থাপন করে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। প্রকৃতি তাদের কাছে দীপের মতো, সেই দীপের আলোকে মনুষ্য হৃদয়কে দীপ্ত করেন প্রস্ফুটিত করেন। আর একদল বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শুধু মনুষ্য-হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তার অতলান্ত রহস্যকে উন্মোচন করেন। তারা আপন প্রতিভা বলেই সব কিছুকে উজ্জ্বল করেন আলোকিত করেন। প্রথম শ্রেণি মধ্যে প্রধান হলেন জয়দেব এবং দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে প্রধান হলেন বিদ্যাপতি।

জয়দেবের কাব্যে প্রকৃতির প্রাধান্য। সেখানে সতত লক্ষ্য করা যায় মধুর রজনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয় শ্রেণি, প্রস্ফুটিত কুসুম, কোকিলাকুজিত কুঞ্জ, নবজলধরের কথা, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রমণীর কমনীয় মুখমণ্ডল, সুরেখা বাহুলতা

বিম্বৌষ্ঠ পদ্মপলাশলোচন প্রভৃতির চিত্র বস্তুত তার কালো বাহ্যপ্রকৃতির অনুপম শোভা যেন ঝলমল করছে। বস্তুত এই শ্রেণির কারণে কবিতায় প্রকৃতি চিত্রটাই বেশি।

বিদ্যাপতি দ্বিতীয় শ্রেণির কবি। তাঁর কাব্যে বাহা প্রকৃতির চিত্র নেই, তা নয়। কিন্তু বা প্রকৃতি অপেক্ষা মনুষ্য হৃদয়ের অতল গভীরে যে ভাব বাজি বিরাজিত তার স্বরূপ উদঘাটন ছিল তার মূল লক্ষ্য। জয়দেব ও বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জয় প্রণীত গেয়েছেন তা বরিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বাহ্য প্রকৃতির দিকে তার দৃষ্টি। কিন্তু বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কবিতা মনুষ্য হৃদয়ের দিকে নিবন্ধ, ফলে তা ইন্দ্রিয়ের সংস্রবন্য, বিলাসশূন্য এবং হয়ে ওঠে। জয়দেবের গীতে ভোগ ও বিলাসের ছবি ফুটে উঠে অন্যদিকে বিদ্যাপতির গীতে কৃষ্ণের পবিত্র প্রণয় আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ ও বেদনার ছবি ফুটে ওঠে। জয়দেবের কাব্য যেন বসন্তের তীক এবং বিদ্যাপতির কাব্য বর্ষার। জয়দেবের কবিতা যেন পদ্মফুলশোভিত স্বচ্ছ ৰারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর। আর বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতীর নদীর মতো। জয়দেবের কবিতা হারের মতো, আর অন্যদিকে বিদ্যাপতির কবিতা যেন রুদ্রাক্ষের মালা। জয়দেবের গান যেন শরীকণ্ঠের গীত, আর বিদ্যাপতির গান যেন সায়াহ্ন বাতাসের নিঃশ্বাস। উপরোক্ত দুই শ্রেণির গীতিকবি ছাড়াও তৃতীয় আর একদল গীতিকবির কথা বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন আধুনিক ইংরেজি গীতিকবির অনুগামী বাঙালী গীতিকবি। সভ্যতা বন্ধিজনিত কারণে আধুনিক কবিগণ ভিন্ন একটি পথে গমন করেছেন। পূর্বেকার কবিগণ নিজেকে চিনতেন, তার চতুপার্শ্বে অবস্থিত নিকটবর্তী মানুষকে চিনতেন। তার নিকটস্থ তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করতেন এবং অননুকরণীয়ভাবে তার ছবি চিত্রিত করতেন। কিন্তু আধুনিক কবিগণ জ্ঞানী—তাঁরা বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাদের চিত্তে স্থান পেয়েছে। তাদের বুদ্ধি বহু বিষয়ে ব্যাপ্ত বলে তাদের কবিতা বহু বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। তাদের বুদ্ধি দূর প্রসবিনী বলে তাদের কবিতাও দূরপ্রকাশিনী হয়েছে। কিন্তু এই বিস্তৃতি গুণের জন্য অন্য একটি দিক দিয়ে বিরাট ক্ষতি হয়েছে। তাদের কবিতায় প্রগাঢ়তার অভাব ঘটেছে। বিয়ের দিক দিয়ে বিদ্যাপতির কবিতা সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ,

কিন্তু কবিত্ব সেখানে প্রগাঢ়। মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বহু বিস্তৃত কিন্তু তাদের কবিত্ব প্রগাঢ় নয়। একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে জল সংকীর্ণ কূপে গভীর, সরাে◌বরে তা ছড়ালে তার গভীরতা থাকে না।

উপসংহারে বঙ্কিম বলেছেন কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির এক নিগুঢ় সম্পর্ক আছে। উভয়ের মধ্যে উভয়ের প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে। বহিঃপ্রকৃতির গুণে মানব হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, তখন মনের অবস্থা অনুযায়ী বাহ্য প্রকৃতি কখনো সুন্দর কখনো বা দুঃখের বোধ হয় । উভয়ের মধ্যে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি কবির বর্ণনীয় তখন অন্ত প্রকৃতির ছায়া সমেত তা ফুটিয়ে তোলা কবির লক্ষ্য হওয়া উচিত। যিনি এটা পারেন তিনি সুকবি। এটা করতে পারলে একদিকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দোষ, অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতার দোষ জন্মায়। উদাহরণ হিসাবে তিনি জয়দেব এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাম উল্লেখ করেছেন। জয়দেব ইন্দ্রিয়পরায়ণতার উদাহরণ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ।

বঙ্কিমের সাহিত্য সমালোচনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ, বর্তমান প্রবন্ধটিতে মধ্যযুগের দুই বিখ্যাত কবির কাব্যবৈশিষ্ট্যকে নিপুণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, এই তুলনা করতে গিয়ে তিনি বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেছেন। তৃতীয়তঃ, প্রাচীন গীতিকবির সঙ্গে আধুনিক গীতিকবিদের পার্থক্য কোথায় তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। চতুর্থতঃ, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক যে অতি নিবিড় তা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ যে এক একটি যুগ পরিবর্তনের ফসল তা যুক্তি সহকারে উপস্থাপিত করেছেন।

পঞ্চমতঃ, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির যিনি মিলন ঘটাতে পারেন তিনি যে সকবি.এম. উচ্চারণ করেছেন।

কিন্তু প্রবন্ধটির কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আমাদের নজরে পড়ে। প্রথমেই প্রবন্ধ নামকরণের কথা আমাদের মনে আসে। নামকরণ বিদ্যাপতি ও জয়দেব'-এর বদলে 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' হলেই যুক্তিসঙ্গত হত। কারণ জয়দেব ছিলেন বিদ্যাপতির থেকে বহু বছর আগের কবি । উভয়ের কালগত ব্যবধান প্রায় চারশ বছর। সুতরাং জয়দেবের নাম আগে থাকলে কাল পরম্পরা লক্ষিত হত।

দ্বিতীয়তঃ, প্রবন্ধটির নামকরণ বিদ্যাপতি ও জয়দেবের নামানুসারী হলেও তাদের কথা আছে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বাকি দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে রামায়ণ মহাভারত দর্শন পুরাণের কথা। ফলে আলোচনার মুখ্য বিষয়টি কিছুটা অবহেলিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, গীতিকাব্যের উদ্ভবের যে কারণ বঙ্কিম দেখিয়েছেন তা কতটা যুক্তিসঙ্গত সে প্রশ্ন উঠতে পারে। বাংলাদেশের কোমল জলবায়ু এবং বাঙালীর নরম হৃদয় গীতিকাব্যের উদ্ভবের কারণ বলে বঙ্কিম মনে করেছেন। কিন্তু গীতিকাব্য শুধু বাংলাদেশের কাব্য ফসল নয়। সারা পৃথিবী জুড়েই গীতিকাব্য রচিত হয়েছে। আর সেসব দেশের জলবায়ু তো নরম প্রকৃতির নয়। তাহলে সেইসব গীতিকাব্য রচিত হচ্ছে কীভাবে?

চতুর্থতঃ, জয়দেব বিদ্যাপতির পারস্পরিক তুলনা করতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুক্তিনিষ্ঠার পরিবর্তে আবেগ উচ্ছ্বাসের পথ অবলম্বন করেছেন।

যেমন—(১) জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ, (২) জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। (৩) জয়দেব ভাোগ, বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। (৪) জয়দেব কবিতা স্বর্ণহার বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। (৫) জয়দেবের কবিতা উৎফুল্লকমলজালশোভিত বিহঙ্গামাকুল স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর, বিদ্যাপতির কবিতা দরগামিনী বেগবতী তরঙ্গাসংকুলা নদী। (৬) জয়দেবের গান সুরজবীণাসঙ্গিনী কিগাতি, বিদ্যাপতির গান সায়াহ্ন সমীরণের নিঃশ্বাস। উক্তিগুলির মধ্যে কবিত্ব বা ভাবাবেগ যতটা আছে যুক্তি ততটা নেই। তবু বলা যায় সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বঙ্কিমই প্রথম। তার পর্বে বিদ্যাসাগর তার 'সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে এর আভাস

দিয়েছিলেন। বঙ্কিম আরও বিস্তারিত ভাবে দুই কবির কবিত্ব বিচারে তুলনামূলক পদ্ধতি সার্থকভাবে প্রয়ে করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনিই পথিকৃৎ।

৩.২ লক্ষ্য

১. প্রত্যক্ষ প্রধান উদ্দেশ্য

দুই কিংবদন্তিমুলক বৈষ্ণব-কবির কবিকৃতির পারস্পরিক মূল্যায়ন করা হয়েছে প্রবন্ধটিতে। অপ্রত্যক্ষ গৌণ লক্ষ্য সমালোচনা সাহিত্যের উন্মেষ লগ্নে আধুনিক দৃষ্টিতে পুরা-কবিতার ভিত্তি সন্ধান করা হয়েছে এখানে। মধ্যযুগীয় গীতিকবিতার চরিত্রকে অনেকটা পাওয়া যায় এ রচনা থাকে। আধুনিক সমালোচনার তরফ থেকে এটিকে ঐতিহ্যতর্পণও বলা যায়।

৩.৩ বিষয়বস্তু

বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার কোনো অভাব নেই। অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষায় এর আধিক্য। বৈষ্ণব কবিরা আবার এ বিষয়ে বিশেষ পারঙ্গম। বৈবীয় গীতিকাব্যের প্রণেতা জয়দেব । বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস- গোবিন্দদাস ইত্যাদি ওই কাব্যের উত্তরাধিকারী ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ-কবি ওয়ালারা (কিয়দংশে) এর উত্তরসূরী। তবে রাম বসু, হরুঠাকুর ছাড়া বাকি কবিওয়ালাদের অধিকাংশ গানই অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য। সকলই নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ থেকে বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সাহিত্যও নিয়মের ফল। কোমৎ ইত্যাদি বিজ্ঞানীরা এই সূত্রের উদ্ভাবক। দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, বিশেষ বিশেষ

নিয়মাধীনে সাহিত্যেরও রূপান্তর হয়। রাজবিপ্লব, সমাজবিপ্লব, ধর্মবিপ্লব এ সবক্ষেত্রে কার্যকারণসূত্র হিসাবে অবশ্যই কাজ করতে পারে।

ভারতীয় সাহিত্যের গতি-প্রকৃতিতে দেখা যায় বিজয়ী আর্যজাতির (বহিরাগত) সঙ্গে বিজিত স্বদেশীয় অনার্যজাতির সংঘতি পরম্পরার ইতিহাসটি কাব্য-সাহিত্যের উদ্ভাবনার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। বীর আর্য জাতির সুনিশ্চিত বিজয়ের প্রতীক চিহ্ন হল রামায়ণ কাব্য। নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে বানর ও রাক্ষসদের অধিগত হওয়ার কাহিনির পিছনে আর্যদের কাছে অনার্য-দ্রাবিড়দের পরাভব কাহিনি লুকিয়ে রয়েছে। আর্যদের করায়ত্ত বিশাল ভারতবর্ষের সমৃদ্ধিশালি যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ বিষয়ে নিষ্কন্টক অথচ সমৃদ্ধির অংশ ভাগ নিয়ে তারা নিজেরাই আত্মব্রিত, তখনই আত্মীয় গৃহবিবাদের রূপক কাব্য মহাভারতের আত্মপ্রকাশ। আত্মবিবাদ অন্তে আর্যরা যখন দেশগঠনে সৃষ্টিমুখী বাণিজ্য বিস্তারে মনাোনিবেশী, তখনই সুখী ও কৃতি জাতির মনোদর্পণ হিসাবে ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনের আবির্ভাব। বহিরঙ্গা সমৃদ্ধির অভিঘাতে মনন ও 'ধী-র রাজ্যেও তখন প্লাবন। ক্রমে সমৃদ্ধ ভারত আত্মসংহতিতে মনস্ক হয়ে ধর্মশৃঙ্খলে সমগ্র জাতিকে বেঁধে ফেললো। ফলত প্রাকৃতিক নিয়মমতে সাহিত্যরসগ্রাহিণী শক্তি ও তাহার বশীভূত হইল। এরই ফলে প্রসূত হল পুরাণ। এই আর্যসমৃদ্ধি পর্বে সাহিত্য দুই মুখে প্রবাহিত হতে লাগলো ১. পুরাণের ধর্মভাবুকতা এবং ২. সুখজাত বিলাসিতার চিহ্নবাহী কাব্য-নাটকাদির চর্চা। এই পথ ধরেই সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের জমিতে আমরা পৌছলাম।

অবশেষে আর্যরা এসে পৌছালেন দেশের পূর্বাঞ্চলে তথা বাংলাদেশে। অচিরেই, তারা এখানকার উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুর অধিগত হলেন। তাপ এবং জলীয় বাষ্পের প্রভাবে তাদের বীর্যগুণ ক্রমেই তিরোহিত হতে লাগলো। ভূমি নিম্না ও পলিগঠিত উর্বরতা শক্তির গুণে সহজফলপ্রদ হওয়ায় কৃষিজ ফসলের জন্য অনেক কম শ্রমশক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন হল। তদুপরি তেজোহানিকর ধান হল তাঁদের প্রধান খাদ্যবস্তু। স্বল্পশ্রমের অভ্যাস, খাদ্যগুণ এবং আর্দ্র জলবায়ুর পরিবেশ প্রভাবে আর্যভার ধীরে ধীরে কোমলতাময়ী, আলস্যপ্রিয় ও গৃহসুখাভিলাষী হয়ে উঠল। এই পরিবর্তিত জাতীয়

প্রকৃতির অনুসরণেই রচিত হল এক নূতন কাব্যপ্রণালী, যার নাম গীতিকাব্য। বিগত সাত-আটশো বছর ধরে এই গীতিকাব্যই অন্য সাহিত্যকে পিছনে ফেলে বাঙালির আদর্শ সাহিত্যস্থানীয় হয়ে উঠেছে।

বাংলার গীতিকাব্যরচয়িতারা প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। ক, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মানবচরিত্রকে স্থাপন করে তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা প্রথম শ্রেণির লক্ষ্য। এই দলের কবিরা মনে করেন, মানুষের হৃদয়রহস্য উদ্ঘাটনে ক্ষেত্রে বাহ্য প্রকৃতিকে দীপ। হিসাবে ব্যবহার করা ভাল। জয়দেব এই শ্রেণির প্রতিনিধি গীতিকবি। ২. অন্য শ্রেণির কবিরা প্রাকৃতিক দীপালোক ছাড়াই মনুষ্যহৃদয় উন্মোচনে পারঙ্গম। বিদ্যাপতি দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত গীতিকবি। বিদ্যাপতি বাহাপ্রকৃতির সম্বন্ধরহিত, একথা কিন্তু চূড়ান্ত সত্য নয়। মানব চরিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধের সত্য তিনিও মানেন। কেবলমাত্র প্রকৃতির বাহ্য বৈচিত্র্য সন্নিবেশের অনিবার্যতা মানেন না। 'জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য।' জয়দেব বহিরেন্দ্রিয়কে বেশি মান্যতা দেন, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসেরা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত রাজ্যে আমাদের নিয়ে যান। জয়দেবের গীতে রাধাকৃন্মের বিলাস, বিদ্যাপতির কবিতায় রাধাকৃরে প্রণয় বিশেষভাবে প্রমূর্ত। জয়দেব বলতে যদি ভোগ, সুখ, স্বর্ণহার ও বসন্তসুখ বোঝায়, তবে বিদ্যাপতিকে আকাক্ষা ও স্মৃতি, দুঃখ, বর্ষা এবং রুদ্রাক্ষহার বলাই শ্রেয়। বিদ্যাপতির প্রণয় রস আধ্যাত্মিকতায় নিষিদ্ধ, সেখানে জয়দেবে কেবলই বিলাসকলা কৌতুহলের সামগ্রী।

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা এক তৃতীয় শ্রেণি পদবাচ্য হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণির গীতকবিতা ইংরাজি সাহিত্যের অনুগামী। এই গীতিকবিতা আধুনিক সভ্যতা বিস্তারের ফসল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুধা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি বহু বিষয়িণী হয়ে উঠেছে। কাজেই কবিতাকেও দূর সম্বন্ধগ্রাহিণী হওয়ার তাগিদে বহু বিষয়িণী হয়ে উঠতে হয়েছে। আধুনিক গীতিকবিতা ভাববিস্তারের গুণে মধ্যযুগীয় গীতিকবিতাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে বিস্তৃতিগুণ ও প্রগাঢ়তা গুণের একাধারে সহবাস অসম্ভব। ফলত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসাদির প্রগাঢ়তা মধুসূদন-হেমচন্দ্রে প্রাপ্তব্য নয়।

কাব্যে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিতে বিরোধের কোনো জায়গা নেই প্রয়োজনানুসারে। একের ছায়া অন্য সম্পাতিত হওয়া খুবই সম্ভব। সুকবি প্রয়োজনানুসারে উভয়ের উচিত সমন্বয় সাধনে সক্ষম। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই কাব্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বা আধ্যাত্মিক দোষে আক্রান্ত হতে পারে। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, Wordsworth।

৩.৪ প্রতিপাদন

জয়দেব-বিদ্যাপতি ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট গীতিকবি এবং বহুসম্বন্ধ গ্রাহিণী আধুনিক গীতিকবিতা থেকে পৃথক অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। কাব্যিক নিত্যতায় এঁরা পরস্পর বিরাোধী নন। সুকবি মাত্রেই নিত্যতার খাতিরে স্বচ্ছন্দে সব মার্গে বিচরণ করতে পারেন। মানবচিত্ত ও প্রকৃতি দুই-ই তাঁর কাছে সমান জরুরি।

৩.৫ সমালোচনার দৃষ্টিকোণ

ক. ব্যক্তি প্রতিভার তুলনামূলক মূল্যায়নের মডেল।

বিদ্যাসাগরই প্রথম সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে সংস্কৃত কবি-নাট্যকারদের সাহিত্যকৃতির পারস্পরিক তুলনা করেন। খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইঙ্গিতমূলক ভাবে এই কাজ তিনি সেরেছিলেন। বঙ্কিম আরও বিশদ করে দুই সমদর্শী কবির ভিন্ন ধাতুপ্রকৃতির তুলনা করেছেন।

সমালোচনার সৃজন পর্বে এটি দৃষ্টান্তমূলক কাজ।

খ. ব্যক্তি তুলনার সূত্রে Genre-এর ওপর আরো গভীর কাজ।

“গীতিকবিতা'র আস্তরণ সমালোচনার পর নয়া genre নিয়ে আরো অন্তর্ভেদী। কাজ বলা যায় এই আলোচনাটিকে। তিন অধ্যায়ে স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বঙ্কিম গীতিকবিতায় মানবমন ও প্রকৃতির সম্বন্ধ স্থাপনার বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করেছেন।

গ. তুলনামূলক পদ্ধতির ওপর দৃষ্টান্তমূলক কাজ।

সমালোচনার ব্যবহারিক শক্তি বাড়ে তুলনামূলক পদ্ধতির ভিতর দিয়ে। সদৃশ বস্তুর তুলনা ও বিসদৃশ বস্তুর প্রতিতুলনায় বিষয়ের প্রকৃতি ও স্বরূপধর্ম পরিস্ফুটতর ভাবেই প্রকাশ পায়। দুই ভিন্ন শ্রেণিভুক্ত দুই কবির তুলনা থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের স্বাতন্ত্রিকতার বৈশিষ্ট্য। আবার বৈশিষ্ট্য উদঘাটনের পরে শিল্প ধর্মের এক ছন্দে তাদের মিলিত হওয়ার অনিবার্যতার কথাও উঠেছে। পরিমিত ভারসাম্যে ভাবগত একদেশদর্শিতাকে কিভাবে অতিক্রম করা যায় তারও হদিশ দিয়েছে এই সমালোচনা।

ঘ. সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রথা প্রয়োগ এই আলোচনা।

সমালোচনাশাস্ত্রের প্রবর্তনার ক্ষণে কালক্ষেপ না করেই বঙ্কিম সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে সমাজতান্ত্রিক সুত্রের নিরীক্ষা প্রয়োগে যত্নবান হয়েছে। যুক্তি বিজ্ঞানের সূত্রানুসারে সবকিছুই অনিবার্যভাবে নিয়মাধীন। সমাজ বিন্যাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের অভিপ্রায়-আকারেরও পরিবর্তন ঘটে। পরিবেশ প্রভাবে, সমাজবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবের কারণে সাহিত্যের রূপান্তর চিহ্নকে বকিম ইতিহাস পরম্পরায় পর্যবেক্ষণে প্রতিপন্ন করে তুলেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের ভূমিগঠন, আবহাওয়া এবং খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে বাংলা গীতিকাব্যের বিশিষ্ট গঠন প্রাপ্তির এক সম্বন্ধসত্র অনুসন্ধানে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। বিচার ভঙ্গিমায় অভিনবত্ব অবশ্যই প্রকাশমান হয়েছে। তবে এই প্রথম প্রযুক্ত পদ্ধতির সর্বাত্মক যৌক্তিকতা ও সাফল্য বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত দেওয়ার সময় তখনও আসেনি। অতএব প্রথম প্রয়োগের বিশেষত্বের দিক থেকেই বিষয়টিকে ভাবতে হবে। আধুনিক কালে সমাজতাত্ত্বিক কার্যকারণ সন্ধানের বহুল জনপ্রিয়তার কথা ধরলে সূচনার কালে বঙ্কিমী উদ্ভাবনাকে মর্যাদা না দিয়ে পারা যাবে না।

৩.৬ কিছু অপূর্ণতার কথা

ক. বিদ্যাপতি ও জয়দেব শিরোনামের পরিবর্তে জয়দেব ও বিদ্যাপতি নামকরণটি বেশি যুক্তিযুক্ত হতো। তাতে ঐতিহাসিক পরম্পরটা কাল ও সময়গত ভাবে ধরা সহজ হত।

খ. প্রবন্ধটির দুই তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারত-দর্শন-পুরাণ এবং কাব্য নাটকাদি উদ্ভাবনার কার্যকারণসূত্রের সন্ধানে। শিরোনামানুসারে দুই কৃতি কবির নাটকাদি উদ্ভাবনার কার্যকারণসূত্রের সন্ধানে। শিরোনামানুসারে দুই কৃতি কবির পারস্পরিক তুলনা জায়গা পেয়েছে এক তৃতীয়াংশে। এতে আলোচনার ভারসাম্য যেমন ঠিক থাকেনি, তেমনি প্রতিপাদ্যতা অনিবার্য হয়ে ওঠেনি। গীতিকাব্যের উদ্ভাবনার প্রশ্নে সমাজ ও পরিবেশের প্রত্ন-প্রয়োগ আচম্বিত। এতে চমক নিশ্চয়ই আছে, প্রায়োগিক সম্ভাব্যতাকে অস্বীকারও করা যায় না। কিন্তু এর সর্বার্থসাধকতার পূর্ণ প্রমাণ তখনও মেলেনি। তাই কেউ কেউ এ প্রয়াসকে অতিরঞ্জন বলে গণ্য করতে পারেন।

গ. জয়দেব ও বিদ্যাপতির পারস্পরিক তুলনায় শেষ অবধি বিশ্লেষণকে ধরে রাখতে না পেরে বঙ্কিম আবেগ উদদীপনার পথ ধরেছেন। তুলনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে দৃষ্টান্তমূলক উপমার উপর্যুপরি ব্যবহার। এ ধরনের আরোহণধর্মী উপমা প্রয়োগে এক প্রকারের উত্তেজনা হয়। জয়দেব ভোগ, সুখ, বসন্ত, স্বচ্ছ সরোবর এবং বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি, বর্ষা, তরঙ্গাশীলা নদী, রুদ্রাক্ষমালা, এ ধরনের পারস্পরিক উপমা প্রয়োগে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু অন্তরের কথা। আদৌ পরিষ্কার হয় কিনা তাতে সন্দেহই থেকে যায়। এ জাতীয় ভাবাপুতা সমালোচনাকে তীক্ষ্ণ ও শাণিত হওয়া থেকে অবশ্যই বঞ্চিত করে রাখে।

৩.৭ শকুন্তলা মিরান্দা দেসদিমোনা

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচক হিসেবে বঙ্কিম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তার আগে রক্ষালাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যাসাগর—এরা সমালোচনা সাহিত্যের ধারায় আংশিকভাবে লেখনী ধারণ করেছেন। বঙ্কিমেরও পৃথকভাবে কোন তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থ নেই। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষিত বঙ্কিম মানস পত্রিকার প্রবন্ধের মাধ্যমে কিছু কিছু সমালোচনা করেন। অভিজ্ঞতাভিত্তিক জীবন পরিক্রমায় যা ভালো লেগেছে পাঠক হিসেবে তাকে উপলব্ধি করে সে সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন। তবে এই সামান্য আলোচনাই পরবর্তীকালের সমালোচকদের সামনে আলোকবর্তিকার ন্যায় ভাস্কর হয়ে উঠেছে। যাই হোক, বর্তমানে আমাদের দেখা দরকার। সমালোচনা বলতে কি বোঝায়।

সমালোচনা বলতে সহজ ভাষায় যা বলা যায় তা হল সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে দেখে, সাহিত্য হিসেবে ভালবেসে, যখন কোন পাঠক তাঁর অনুভূতির প্রকাশ ঘটান তখনই তা সমালোচনা হিসেবে স্বীকৃত লাভ করে। সমালোচনার আবার নানান প্রকারভেদ আছে। যেমন ব্যাখ্যামূলক, বিশ্লেষণমূলক তুলনামূলক ইত্যাদি।

বঙ্কিমের ক্ষেত্রে এর কোনটাই খাটে না। তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। মুক্ত পুরুষ বঙ্কিম সহজ স্বচ্ছন্দভাবে পথ চলেছেন। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও পরবর্তীকালের কাছে প্রেরণাদাতা হিসেবে তা উল্লেখের দাবি রাখে। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত “শকুন্তলা, মিরান্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধটি যা তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার ধারায় বঙ্কিমের নামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এছাড়া তিনি এই ধরনের আর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন যার নাম ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব।’ তবে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দিক থেকে প্রথম প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।

শকুন্তলা কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা এর নায়িকা অপরদিকে Shakespeare-এর কমেডি নাটক Tempest-এর নায়িকা মিরান্দা এবং ট্র্যাজেডি নাটক Othello-এর নায়িকা দেসদিমোনা। সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনা।

বঙ্কিম প্রবন্ধটিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে শকুন্তলা ও মিরান্দা এবং শেষ ভাগে শকুন্তলার সঙ্গে দেসদিমোনার তুলনা করেছেন। মুখ্যতঃ শকুন্তলা চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলাই লেখকের প্রয়াস। বঙ্কিমের মতে মিরান্দা প্রেয়সী, দেসদিমোনা আদর্শ পত্নী আর এ দুয়ের সুষ্ঠু সম্মেলন ঘটেছে শকুন্তলা চরিত্রে।

প্রথমে শকুন্তলা ও মিরান্দার তুলনা করতে গিয়ে বঙ্কিম বলেছেন যে

(১) শকুন্তলা মিরান্দা উভয়েই ঋষিকন্যা, (৩) দৈহিক সৌন্দর্য্যে উভয়েই অতুলনীয়। (৩) উভয়েই বনের মধ্যে প্রতিপালিতা সরলা। তবে শকুন্তলা সরলা হলেও অশিক্ষিতা নয়। কেননা তার লজ্জাই তার শিক্ষা, অপরদিকে মিরান্দা এত সরলা যে তার লজ্জা নেই। (৪) নায়কদের সংস্পর্শে আসার পূর্বে পরপুরুষ সম্পর্কে উভয়েই কোন ধারণা ছিল না।। (৫) উভয়ের ক্ষেত্রেই নায়ককে দেখা মাত্র প্রণয় লিপ্সা জাগ্রত।

৩.৮ বৈসাদৃশ্য

শকুন্তলা সমাজ প্রদত্ত সংস্কারপন্না লজ্জাশীলা, অতএব তার প্রণয় আভাসে তিগতময় বাক্য দ্বারাই পরিস্ফুট। শকুন্তলার প্রণয়ে লুকোচুরি আছে কিন্তু মিরান্দাতে কোন রূপ কাপট্য নেই। বঙ্কিম সূক্ষ্ম বুদ্ধি সহযোগে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে চরিত্রদ্বয়ের অন্তনিহিত সত্তাকে আবিষ্কার করেছেন। যার জন্য শকুন্তলা চরিত্রের বিবর্তনটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। শকুন্তলা চরিত্রটিকে লেখক দুটি অংশে বিভক্ত করেছেন। যথাক্রমে প্রাক প্রণয় পর্বে শকুন্তলা এবং দুষ্মন্ত প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলা।

প্রথম পর্বের শকুন্তলা সরলা মুগ্ধা, প্রণয় বাসনা পিয়াসী বালিকামাত্র, অপরদিকে দুষ্যন্ত প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলা প্রণয় ভিখারী নয়, সে আসন্ন মাতৃত্বের গৌরবে গৌরবান্বিতা ব্যক্তিত্বময়ী, আত্মমর্যাদা জ্ঞান সম্পন্ন সম্রাট-মহিষী।

তাই এই অংশের শকুন্তলা মুখর, প্রেয়সীমাত্র নয়, রমণী। এখানে রাজপ্রাসাদের অনুগ্রহ অভিলাষিণী তপস্বীকন্যা শকুন্তলা করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র।

কিন্তু এতদূর তুলনা করেও বঙ্কিম তৃপ্ত হতে পারেননি। কারণ শকুন্তলার পূর্ণ স্বরূপোঘাটন লেখকের অভিপ্রায়। তাই তিনি দেসদিমোনাকে আনয়ন করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করেন যে শকুন্তলা ও দেসদিমোনা উভয়ে তুলনীয় এবং অতুলনীয়।

৩.৯ তুলনীয়

(১) দুজনেই গুরুজনের বিনানুমতিতে পরপুরুষে আত্মসমর্পিতা।

(২) উভয়েরই আশালতা অসম্পূর্ণ।

(৩) উভয়েই স্বামীপরিত্যক্তা।

(৪) উভয়েই সতী কিন্তু সতীত্বের তারতম্য বিচারে দেসদিমানার উচ্চতা। কেননা দেসদিমোনার কোন অভিযোগ নেই, সে সহিষ্ণুতার ধৈর্য্যতার মানসীমূর্ত্তি, তার কাছে আত্মবিশ্বাসটাই বড়। অচলা স্বামীভক্তির পরাকাষ্ঠা দেসদিমোনা। শকুন্তলাও সতী, তার ক্ষেত্রেও স্বামীভক্তি স্বীকৃত কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সে দলিতা ফণিনীর ন্যায় ফুসে উঠেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আবিষ্কার করা গেলেও দেসদিমোনা গরিয়সী। তবে উভয়ের পার্থক্য বিরাজমান। এই পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বঙ্কিম বলেছেন যে দুই ভিন্ন বস্তুতে তুলনা হয় না। কাননে সাগরে তুলনা হয় না এবং এই সূত্রে নাটক ও উপাখ্যানের পার্থক্যটি স্পষ্ট করেছেন।

বঙ্কিম বলেছেন শকুন্তলা কাব্য, ওথেলো নাটক। নাটক ও কাব্য কেবল রূপে নয় ভাবে অর্থাৎ অন্তরচরিত্রেও ভিন্ন প্রকৃতির। কিংবা শকুন্তলা যদি নাটকও হয় তা ভিন্নরীতির ভিন্ন মনজাত, তাই বঙ্কিমের মতে শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র অর্থাৎ স্থির, নিশ্চল। অপর দিকে দেসদিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীব, সচল মূর্তি।

এই প্রসঙ্গে তিন আরও বলেছে*ন যে* উক্তি প্রত্যুক্তিতে লেখা যে কোন গ্রন্থই নাটক নয়। নাটকে গতি থাকা প্রয়োজন তা এই নাটকদ্বয়ে অর্থাৎ শকুন্তলায় ও মিরান্দায় নাই। অপর পকে 'ওথেলো' নাটক। পূর্বোক্ত কাহিনিদ্বয় নাট্যকারে তুলনাহীন উপাখ্যান কাব্য।

উপরিউক্ত প্রবন্ধটির মূল ভাববস্তর আলোচনার পর এবারে দেখা যাক এই ধরনের সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমের কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

জনৈক সমালোচকের মতে তুলনা ছাড়া সমালোচন হয় না। কোন বস্তুর সঠিক নিরূপণের জন্য তুলনার প্রয়োজন। কিন্তু তা হোক বা না হোক অন্য প্রসঙ্গ। বঙ্কিম যতটুকু বলা যায় তা হল

প্রথমতঃ, বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দান করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, যে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে তিনি চরিত্র ত্রয়ের তুলনামূলক আলো, করেছেন তাতে বঙ্কিমের অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং মণীষার পরিচয় পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, উদাহরণের মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা করার পদ্ধতি অর্থাৎ শকুন্তলা ও দেসদিমোনার পার্থক্য চিহ্নিত করতে গিয়ে উপাখ্যান ও নাটকের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই পদ্ধতির অনুসরণে দেখা যায় পরবর্তীকালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায়।

চতুর্থতঃ, উপমা ও আলঙ্কারিক প্রয়োগ সহজ সরল উপমা ও উদাহরণের দ্বারা তা পাঠকের অনুগ্রহ বোধগম্য করে তোলা বঙ্কিমের মূল লক্ষ্য।

পঞ্চমতঃ, বঙ্কিম এই প্রবন্ধে বিচারবোধ ও রসবোধের সার্থক মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। সাহিত্য সমালোচনামূলক অন্যান্য প্রবন্ধের তুলনায় এখানে সমালোচনা সৃজনধর্মী হয়ে উঠেছে। যদিও তা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কারণ একই শকুন্তলা চরিত্রকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্যে' যে প্রবন্ধ রচনা করেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা শক্তির প্রাচুর্য্য। শকুন্তলাকে নবীন লাবণ্যে ও মাধুর্যে স্থাপিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা চরিত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দান করে স্বর্গ-মর্ত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নির্ভর প্রেম মঙ্গল ও কল্যাণের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে তা সমাজ ও দেবতার

অনুমোদন লাভ করেছে। তথাপি একথা স্বাকার। করতে বাধা নেই যে, উক্ত প্রবন্ধের প্রেরণাই রবীন্দ্র সৃজনীমানসকে গড়ে তুললে সাহায্য করে।

সতরাং রবীন্দ্রনাথের মত না হলেও বঙ্কিমের এই প্রবন্ধ সমালোচনা সাহিত্য হলে যে বিশেষ পরিচিত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধু তাই নয় প্রথম প্রয়াসের নিদর্শনকে কেন্দ্র করে, পরবর্তীকালের সমালোচকমানস প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং এই দিক থেকে তুলনামূলক সমালোচনা সাহিত্যের ধারায় বঙ্কিমের 'শকুন্তলা, মিরান্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৩.১০ লক্ষ্য

১. প্রত্যক্ষ ও প্রধান লক্ষ্য শকুন্তলা চরিত্রের অন্ত প্রকৃতি বিশ্লেষণ।

কালিদাসের বিখ্যাত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'-এর নায়িকা শকুন্তলা চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটন বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য। প্রেম, বিবাহ (গান্ধর্ব), সন্তানধারণ এবং স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হওয়া এই চতুর্দশার মধ্যে শকুন্তলার চরিত্র স্বভাব

কিভাবে ফুটে উঠেছে তারই প্রসঙ্গ নিয়ে এই আলোচনার অবতারণা।

২. গৌণ ও অন্তর্লীন লক্ষ্য (অপ্রত্যক্ষ) হল বিদেশিনী নায়িকাদের সঙ্গে তুল্যমূল্যে ভারতীয় নারীর চরিত্রাদর্শের ব্যাখ্যা দেওয়া এবং যতদূর সম্ভব তার শ্রেয়ত্ব প্রতিপন্ন করা।

৩.১১ বিষয়বস্তু

প্রথম *প্রস্তাবে শকুন্তলা ও মিরান্দা* তুলনায় উভয়চরিত্রের মিলের অংশ—

ক. উভয়ের ঋষি (রাজর্ষি) কন্যা।

খ. তপোবন-দ্বীপে ঋষিপালিতা বলেই এদের স্বভাব সৌন্দর্যে গুণগত অভিনবত্ব রয়েছে।

গ. নির্জন অরণ্য, তপোবন ও দ্বীপে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য সরলতা, পবিত্রতা ও সৎ হৃদয়ভাব এদের প্রধান চরিত্রগুণ।

ঘ. লোকালয়ের সমাজ পরিবেশে প্রতিপালিতা না হওয়ার কারণে এদের চরিত্র সর্বৈব কালিমামুক্ত।

অমিলের অংশ

ক. শকুন্তলার চিত্তবন্দন অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে। নিরীহ তপোবনপালিত জীবের (প্রাণীর) সঙ্গে তার নিত্য আত্মীয়তা। এমনকি বৃক্ষ ও তরুলতার সঙ্গেও তার অব্যক্ত কথোপকথন চলে। এই প্রকৃতিসংসারের একাংশ হয়ে সে সুখী। মিরন্দা দ্বীপবাসিনী হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে দ্বীপ-প্রকৃতির প্রতি কোনো অদম্য আকর্ষণ গড়ে ওঠেনি।

খ. শকুন্তলা সরলা, কিন্তু অশিক্ষিতা নয়। সমাজ শিক্ষার লক্ষণ তার মধ্যে বর্তমান। সহজাত লজ্জাই তার শিক্ষাভূষণ। মিরন্দাও সরলা, কিন্তু তার লজ্জার কোনো সংস্কার বা বালাই নেই। কারণ তপোবন লোকশূন্য নয় তাই সমাজ শিক্ষার অভ্যাস অনুশীলনের অতি অধিশাত। আর জন পরিত্যকা দ্বীপে এরকম কোনো সংস্কার সংগঠিত হয়ে ওঠার অবকাশ পায়নি।

লৌকিক লজ্জা-সংস্কারের সংস্রব না থাকলেও মিরন্দা চরিত্রে অপরাপর সকল চিত্তগুণই বর্তমান। পরদুঃখকাতরতা ও স্নেহশীলতা তার চরিত্রের সদর্থক অংশ। আর 'লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা তাহা আছে। ফার্দিনান্দের (বিতাড়িত রাজপুত্র) সঙ্কো প্রণয়লিপ্ততার অংশে এই সব গুণধর্ম সর্বাধিক প্রকাশিত। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা ও ফার্দিনান্দ মিরন্দার প্রণয় কথা এ জন্য সর্বপ্রথমেই বিচার্য।

শকুন্তলার দুষ্মন্তের প্রতি উদগত প্রেম যতটা না ভাষায় প্রকাশিত, ততোধিক আচরণ লক্ষণে ও ছলনাময়তায় প্রত্যক্ষগোচর। লজ্জাশীলতার ছদ্ম আবরণ টেনে, আপাত অনাসক্তির ভান করে, আচরণগত ছলনার সাহায্যে যে তার প্রেমোদ্দীপনাকে সূচীমুখ

করে তুলেছে। সঙ্কেতে ভাববিনিময়ই শকুন্তলার বিশিষ্টতা। অপর দিকে মিরন্দা প্রথমাবধি নিঃসঙ্কোচ। কি পিতা, কি প্রণয়পাত্রের কাছে সে অকপট। আর এই অকপটতাই তার পবিত্রতাকে দীপ্যমান করে তুলেছে। শকুন্তলা কন্ব-গৌতমীর কাছ থেকে দীর্ঘদিন তার প্রণয়বন্ধন ও গোপন বিবাহের কথা আড়াল করে রেখেছিল। গর্ভসঞ্চারের পর এ তথ্য গুরুজনেরা ভয়াত হন। আর মিরন্দা ফার্দিনান্দ দর্শনে প্রথম চিত্ত চঞ্চল্যর পরই পিতা প্রস্পেরাকে জানিয়েছিল—This is the third man that e'er I saw, / the first ever I sighd for, আবার, বিবাহ বা প্রণয়প্রস্তাবে শকুন্তলা দুই সখি প্রিয়ম্বদা ও অনুসূয়ার পূর্ণ সাহায্য নিয়েছিল। সঙ্কোচশূন্য মিরন্দার এসব কিছুর প্রয়োজন হয়নি। সে নিজেই তার প্রণয়প্রস্তাব বহন করে নিয়ে গেছে ফার্দিনান্দের কাছে।

I am your wife, if you will marry me;

If not, I will die your maid: to be your fellow

You may deny me; but I will be your servent,

Whether you will or no.

একেবারে নাছোড়বান্দা শর্ত। কোনো মধ্যপন্থা গ্রহণের সুযোগ নেই। রোমিও জুলিয়েটের বিখ্যাত প্রণয়সম্ভাষণকে অবলীলাক্রমেই অতিক্রম করে গেছে এই চিত্তভাব।

অকৃত্রিম চিত্তগৌরবে শকুন্তলা অংশত ম্লান। কিন্তু এজন্য কালিদাস দুষণীয় নন। শকুন্তলা চরিত্রের উত্তরাংশের নারীগৌরব-এর সঙ্গে যুক্ত হলে শকুন্তলা চরিত্রের মহিমা অন্যমাত্রা পাবে, যা দ্বিতীয় প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়। শকুন্তলা চরিত্রের প্রথমাংশে (প্রেমাসক্ত হওয়ার পর্ব) প্রণয়াসক্ত রমণীতে 'বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম ; কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য, রমণীর স্নেহ কই ?' এর কারণ দ্বিবিধ।

১, শকুন্তলা এই অংশে দুষ্মন্তের চরিত্র গৌরবে অনেকটা ঢাকা পড়ে গেছে। প্রথিতযশা, সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি রাজা দুষ্মন্তের বৈভবছটার কাছে শকুন্তলা ম্লান।

২. শকুন্তলা চরিত্রের বিস্তার ঘটবে উত্তরাধে। প্রণয় প্রার্থিনী শকুন্তলার মধ্যে যেদিন ‘পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতার ভাব স্পর্শ ঘটবে সেদিনই তার পূর্ণ নারীত্বের উদ্ভাসন সম্ভবপর হবে।’ মিরন্দার সঙ্গে ভাবসংশ্লিষ্টতা শকুন্তলা চরিত্রের সুতরাং ওই এক দৃষ্টান্তে শকুন্তলার পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। উত্তর কাণ্ডের অবতারণার কারণ একটিই,—“শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, তাহাই দেখানো।

দ্বি*তীয় প্রস্তাবে শকুন্তলা ও দেসদিমোনা*

উভয় চরিত্রের তুলনায় মিলের অংশ

ক. গুরুজনের অনুমতি ছাড়াই উভয় নায়িকা আপন পছন্দমত ইঙ্গিত নায়ককে নির্বাচন করে নিজ জীবনে পতি হিসাবে বরণ করেছিল।

খ. উভয়েরই মুগ্ধতার প্রথম কারণ ছিল নায়কের বীরত্ব ভাব।

গ. উভয়েরই দাম্পত্য জীবনে পরিপূর্ণতা আসেনি। একত্র জীবনযাত্রার সূচনালগ্নে বা, মধ্যপথে এরা দুজনেই স্বামীর প্রেমপ্রসাদে বর্ণিত হয়েছে। শকুন্তলা দুষ্মন্ত কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েছে। আর দেসদিমোনার পূত চরিত্রের প্রতি ভ্রান্ত

সন্দেহের কারণে স্বামী ওথেলো তাঁর জীবননাশের কারণ হয়েছে।

ঘ. উভয়েই স্বামীদের প্রত্যাখ্যান ও নির্যাতন সত্বেও ভারতীয় মতের সতীত্বের পরাকাষ্ঠা হয়েছে। উভয় নারীর দৃষ্টান্ত যোগ্য আচরণে কিছু মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্বেও স্বামীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে দুজনেই

সমান নিষ্ঠাবতী।

তুলনায় অমিলের অংশ

ক. দেসদিমানা অবিচল ভক্তিমতী, শকুন্তলা আত্মমর্যাদাপরায়ণা । দেসদিমোনা মনে করে, স্বামীর প্রতি আস্থা পোষণ না করাই অসতীত্ব। তাই ওথেলোর প্রহার, অত্যাচার সবই যে মুখবুজে সহ্য করে। স্বামীর ছুরিকাঘাতের সময়ও অপ্রতিরোধের অনন্য নমুনা

দেখিয়েছে। স্বামীর অপকর্মকে আবৃত করার জন্য মৃত্যু দায়কে নিজের ঘাড়ে তুলে নেওয়ার অনন্য নজির তার মধ্যে পাওয়া যায়। শকুন্তলা সতীধর্মে নারীর ঔচিত্যকে বজায় রেখেও আত্মমর্যাদাকে শেষ পর্যন্ত চরম মূল্য দিয়েছে। তাই প্রকাশ্য রাজসভায় দুষ্মন্ত কর্তৃর্ক চারিত্রিক দোষারোপের মুহূর্তে পাল্টা ভর্ৎসনায় তাকে ঝলসে উঠতে দেখেছি আমরা।

খ. স্বামীকে বেতসলতার মতা বেষ্টন করেই দেসদিমোনার সুখ। ঐ সুখেরই স্বার্থে সকল আত্মস্বার্থের বিসর্জন দিতে তার কার্পণ্য নেই। আত্মতৃপ্তি এবং বিপুল ক্ষমাশীলতাই তার চরিত্রের ঐশ্বর্য। শকুন্তলা তপোবনকন্যা হলেও রাজেন্দ্রাণীর মতোই অবিচল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অকারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদেই সে অনন্যা হয়ে উঠেছে। তাই অন্যপক্ষ তার নিষ্ঠাপরায়ণতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললে তাকে অনায়াসেই প্রতিবাদ করতে দেখা যায়।

৩.১২ তৃতীয় প্রস্তাবেই আসল বক্তব্য

তুলনায় মিল-অমিলের অংশ উদঘাটিত করার পর বঙ্কিমচন্দ্র আবিষ্কার করেছেন যে, মিরান্দা ও শকুন্তলার গোত্রধর্মে মিল থাকার জন্য তারা অনেক বেশি পরস্পর সন্নিহিত। দেসলিমোনার সৃষ্টিগত ধাতু-উপাদান পৃথক হওয়ার জন্যই সে তুলনীয়তার মানদণ্ডে শকুন্তলা থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে। তৃতীয় প্রস্তাবের এই বিচারে বঙ্কিম সাহিত্যসূত্রের এক ভিত্তিত প্রশ্নকে সামনে এনেছেন। ভারতবর্ষে আমরা নাটকমাত্রকেই দৃশ্যকাব্য বলি। অর্থাৎ দৃশ্যপরায়ণতার সঙ্গে কাব্যের মানরক্ষাকেও আমরা সমান মর্যাদা দিতে প্রস্তুত। য়ুরোপ নাটকের বিশিষ্টার্থকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য কাব্যকল্পনায় অগ্রসর অথচ কম ক্রিয়াপরায়ণ সৃষ্টিকে সেখানে। পৃথক করা হয়। ওই মানদণ্ডে এরূপ সৃষ্টিকে উপখ্যান কাব্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। বঙ্কিমের মতে, কালিদাসের শকুন্তলা এবং শেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট উপাখ্যান কাব্য। তাই সমগোত্রীয়তার কারণে এদের মধ্যে মিলের ভাগই বেশি। ওথেলো ক্রিয়াত্মক নাটক হওয়ার জন্যই দেসদিমোনার দ্বন্দ্ব-দহনে

ঐকান্তিকতা ও তীব্রতা অধিক। শকুন্তলা যেখানে পাল্টা প্রতিরোধের কথা বলেই চিত্রার্পিত হয়ে থাকে, সেখানে দেসদিমোনা সরবতা ও ক্ষরণে প্রতিটি মুহূর্তকে মৃত্যু পর্যন্ত সজীব করে রাখতে পারে। এ জন্যই বঙ্কিমকে বলতে হয়

ক. দেসদিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরা ধ্যানপ্রাপ্য

খ.শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেসদিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীব প্রায় গঠন। সুতরাং দেদিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেসদিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না।

৩.১৩ প্রতিপাদন

তৃতীয় প্রস্তাবের পরিণামী অংশ দেখে ভুল প্রতিপাদ্যতার ধারণায় আমরা যেন পৌছাই। অর্থাৎ প্রথম প্রস্তাব এবং তৃতীয় প্রস্তাব মিলিয়ে মিরন্দা ও দেসদিমোনার চরিত্র-চিত্রণকে কালিদাসের শকুন্তলার তুলনায় শ্রেয়তর মনে করা। না, তা একেবারেই নয়। সাহিত্য সমালোচনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ওগুলি প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের বিষয়। সমগ্র প্রবন্ধের প্রতিপাদ্যতা যে অন্যত্র তা বঙ্কিমের পরিণামী মন্তব্যেই প্রকাশ পায়।

• শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেসদিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেসদিমোনার অনুরূপিনী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিনী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্কিমের এই মন্তব্য থেকে বাংলা সমালোচনায় একটা ধারার জন্ম হয়েছে। শকুন্তলা যোগ্য চরিত্র যাদের জীবন প্রণালীকে প্রথমার্ধ ও উত্তরার্ধ এই দুই পরিষ্কার রিভাজনে পৃথক করা যায়, তাদের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য আমদানিকৃত স্বধর্মী চরিত্রের তুলনামূলক সন্নিবেশ এক চৌকস পন্থা। বঙ্কিমের এই পথ প্রদর্শন বিফলে যায়নি। রবীন্দ্রনাথও "শকুন্তলা" প্রবন্ধে মূল চরিত্রটিকে আধাআধি বিভাজিত বঙ্কিমচন্দ্র করে নিয়েছেন—তরুণ বয়সের ফুল ও পরিণত বয়সের ফল এই নামে। অবশ্য অন্য কোনো চরিত্রের সঙ্গে প্রতিতুলনার আড়ম্বর সেখানে নেই।

৩.১৪ সমালোচনার দৃষ্টিকোণ

সমালোচনার গুণবত্তার দিক দিয়ে বর্তমান প্রবন্ধটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। উন্নত ও পরিপক সমালোচনার নিদর্শন বলা চলে এটিকে। বাংলা সমালোচনা সাহিত্য সূচনালগ্নেই কতটা এগিয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণচিহ্ন হিসাবে প্রবন্ধটিকে দাখিল করা যায়।

প্রথমত, এটি চরিত্র সমালোচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সমন্বয়ে এটি শকুন্তলার চরিত্রধর্মের যথাযথ উপস্থাপনা।

দ্বিতীয়ত, সদৃশ (integral) ও বিসদৃশ (differential) তুলনা পদ্ধতির একটি নিখুঁত মডেল বলা যায় প্রবন্ধটিকে। তৃতীয়ত, কৌশল (১) হিসাবে মূল চরিত্রটিকে আখ্যানের মাঝ বরাবর বিভাজিত করে দুটি টুকরো বার করা হয়েছে। গান্ধর্ব বিবাহ হল কেন্দ্রীয় বিভাজন রেখা। প্রাক-বিবাহ এবং উত্তর-বিবাহ দুই ভিন্ন পর্বে পৃথক দৃষ্টিপাত করেছেন সমালোচক।

চতুর্থত, কৌশল (২) হিসাবে দুই পৃথক খণ্ডের সঙ্গে পৃথক পৃথক তুলনীয়তায় দাঁড় করানো হয়েছে দুই বিদেশিনী রমণীকে—মিরন্দা এবং দেসদিমোনা। তুলনাযোগ্য চরিত্র দুটিকে অখণ্ড অবস্থায় আনা হয়নি বা এঁদের জীবনও দু-খণ্ডের সমাহার একথা বলা হয়নি। মিরন্দা ও দেসদিমোনার চরিত্র ভূমিকার দুই অংশকে পৃথক পৃথক contrast-এ সংযোজিত করা হয়েছে শকুন্তলা চরিত্রের সঙ্গে।

পঞ্চমত, কৌশল (৩) হিসাবে চরিত্রালোচনাকে তারই অভ্যন্তরীণ আচরণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রেখে পুঙ্খানুপঙ্ক ব্যাখ্যার সাধারণ দৃষ্টান্তের বদলে চরিত্রকে আখ্যানবৃত্ত থেকে তুলে এনে বহিরঙ্গ তুলনায় সামিল করা হয়েছে।

এই ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগের ফল হয়েছে এই,

ক. মূল শকুন্তলা চরিত্রের দ্বিমাত্রিকতা আমরা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি।
কুমারী শকুন্তলার প্রণয়ভজনা সাহিত্যের প্রথাবদ্ধ রূপায়ণের সম্পূর্ণ অনুরূপ। প্রেমিকা

শকুন্তলার চরিত্রস্ফোটন হয়েছে প্রণয়কলাচাতুর্যের স্বীকৃত নিয়মমতেই। উত্তরার্ধের শকুন্তলা সামাজিকতা জ্ঞানে অনেক স্থিতধী, ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও আত্মমর্যাদাবোধে গরিয়সী। প্রণয়প্রার্থিনী নারীর মধ্য থেকে দায়িত্বজ্ঞানযুক্তা মাতৃত্বের মুক্ত রূপটি বেরিয়ে এসেছে। দুষ্মন্তের প্রত্যাখ্যান প্রতিক্রিয়াকে শুধুই অনাবৃত নারীত্বের মানদণ্ডে শকুন্তলা দেখেননি। তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের ভবিষ্যৎ শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোন সামাজিক পরিচিতির প্রশ্নটিও দারুণভাবে জড়িত। এই যৌথ দায়িত্ববোধের তাড়নাতেই তাঁকে প্রতিবাদে সরব হতে হয়েছে। 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধের দৃষ্টান্তে আমরা এক নতুন নির্দেশিকা পেয়েছি। চরিত্র সমালোচনার গুণগত মানবৃদ্ধি ও বিস্তারের স্বার্থে। অন্য সাহিত্যের চরিত্রদেরও প্রয়োজনবোধে আকর্ষণ করা যায়। তাতে সমালোচনার integrity আরো বাড়ে। আলোচনার গুণে বর্তমান প্রবন্ধ থেকে এ কথা সহজেই প্রতীত হয়েছে যে, সৃষ্টিশীলতার দেশ ও সময়ভেদের কোনো গণ্ডি থাকে না। মিরন্দা ও শকুন্তলার সমধর্মিতা বিশ্লেষণ গুণে যখন প্রকট হয়েছে তখন কখনো কখনো মনে হয়েছে টেম্পেষ্ট এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম যেন একদেশীয় স্রষ্টারই দুই আলাদা আলাদা সৃষ্টি। সাহিত্যের সর্বজনীনতার সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার এমন একটা মহোত্তম সুযোগ বঙ্কিম পাঠককে উপহার দিয়েছেন।

৩.১৫ অনুশীলনী

১।শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমনা প্রবন্ধ অবলম্বনে সমালোচক বঙ্কিমের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

২।'শকুন্তলার কবি যে টেম্পেস্ট এর কবি হইতে নিষ্প্রভ নহেন ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াত শিকার করিলাম।' কোন প্রবন্ধের অংশ ?যে প্রসঙ্গে কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা।

৩।বিদ্যাপতি ও জয়দেব প্রবন্ধে যে তুলনামূলক আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন তার পরিচয় দাও।

৩.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত- বঙ্কিমচন্দ্র ১৯২০

অজরচন্দ্র সরকার -বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য -বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

অলোক রায় -প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ মন

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়- সমালোচনা রূপরেখা,বঙ্কিম পর্ব

প্রমথনাথ বিশী- সাহিত্যচিন্তা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একক ৪ - গীতিকাব্য

বিন্যাসক্রম

৪.১ আলোচনা

৪.২ লক্ষ্য

৪.৩ বিষয়বস্তু

৪.৪ প্রতিপাদন

৪.৫ গীতিকাব্য সমালোচনার দৃষ্টিকোণ

৪.৬ অল্প কিছু অপূর্ণতা

৪.৭ অনুশীলন

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ আলোচনা

কাব্য কাকে বলে সে সম্পর্কে আলঙ্কারিকেরা ও পণ্ডিতজনেরা নানা মতামত দিয়েছেন এবং নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন কিনা জানা যায়নি। আমরা কাব্য বলতে যা বুঝি (অর্থাৎ ছন্দ বন্ধ কবিতা) বঙ্কিমচন্দ্র তার সীমাকে বহুদূর প্রসারিত করে পুরাণ, নাটক, এমনকি ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসগুলিকেও কাব্যশ্রেণিভুক্ত করেছেন।

ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্য আলংকারিকদের মতো কাব্যকে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত না করে বঙ্কিমচন্দ্র মোটামুটিভাবে তাকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগে ফেলেছেন দৃশ্যকাব্যগুলিকে অর্থাৎ নাটকগুলিকে, দ্বিতীয় ভাগে অখ্যানকাব্য মহাকাব্য এমনকি বাসবদত্তা ও কাদম্বরীর ন্যায় গদ্য কাব্যগুলিকে এবং তৃতীয় ভাগে ফেলেছেন খণ্ডকাব্যগুলিকে। এই খণ্ডকাব্যের মধ্যে তিনি গীতিকাব্যকেও স্থান দিয়েছেন। উপরোক্ত ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত পার্থক্য আছে। কিন্তু রূপগত পার্থক্যই একমাত্র বিবেচ্য নয়। যেমন দৃশ্যকাব্য সাধারণত কথোপকথনের দ্বারাই লিখিত হয় এবং রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। কিন্তু শুধুমাত্র সেই কারণেই যা কথোপকথনের দ্বারা লিখিত তা-ই নাটক নয় । কথোপকথনের দ্বারা লিখিত অসংখ্য গ্রন্থ ভ্রান্তিবশত নাটক বলে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি নাটক নয়। Comus, Manfred, Foust নামক গ্রন্থগুলি কথোপকথনের দ্বারা প্রথিত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি নাটক নয়, সেগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য। কালিদাসের শকুন্তলা ও ভবভূতির উত্তররামচরিতকেও অনেকে নাটক বলে স্বীকার করেন না। নাট্যরূপে লেখা হলেও সেখানে কাব্যের ভাবটি বেশি। পক্ষান্তরে জার্মান কবি গ্যেটে বলেছেন যে কথোপকথনের দ্বারা গ্রন্থন বা অভিনয় উপযোগিতা নাটকের অবশ্য স্বীকার্য বৈশিষ্ট্য নয়। সেজন্য ইংরেজ ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কুটের উপন্যাস “Bride of Lammermoor'-কে কেউ যদি নাটক বলে অভিহিত করেন তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ উপন্যাসটির অনেক স্থান অসাধারণ নাটকীয়তায় ভরা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আখ্যানকাব্য যেমন নাটকাকারে রচিত হতে পারে। তেমনি নাটকাকারে রচিত গ্রন্থও উৎকৃষ্ট কাব্য হতে পারে। সেজন্য রূপগত বৈষম্য বাহ্যিক, গ্রন্থের অন্তনিহিত ভাব ঐশ্বর্য বিবেচ্য।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বক্তার ভাব উচ্ছাসের পরিস্ফুটন যে কাব্যের উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য। তিনি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈয়ব কবিদের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গানা, নবীনচন্দ্র সেনের অবকাশরথ্রিনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলিকে গাতিকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এখন প্রয়োজন হল একজন গীতিকবি ও একজন নাট্যকার—কার অধিকারের সীমা তদূর তা বিচার করা। যখন আমাদের হৃদয় কোন বিশষ ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় তখন তার সমুদয় অংশ কখনই ব্যক্ত হয় না। কিছুটা ব্যক্ত হয় কিছুটা অবাক্ত থাকে। যতটুকু ব্যক্ত হয় তা কথার দ্বারা নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ব্যক্ত হয়। এই ব্যক্ত অংশটুকু নাট্যকারের অবলম্বন। কিন্তু যা অব্যক্ত থাকে তা গীতিকবির সামগ্রী। যা দেখা যায় না যা অন্যের অনুমানের অতীত অথচ তা গীতিকবির সমগ্রী। যা দেখা যায় না যা অন্যের অনুমানের অতীত অথচ যা বিশেষ ভাবাবেশে ব্যক্তি হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত তাকেই পাতিকাব্য প্রণেতারা রূপ দান করেন। কিন্তু যারা মহাকাব্যে রচয়িতা তাদের বিশেষ গুণ এই যে তাদের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভন্ন বিষয়ে অধিকার থাকে, দুটিই তাদের আয়ত্তাধীন। মহাকাব্যের সঙ্গে নাটক ও গীতি কবিতার এই পার্থক্য। অনেক নাট্যকার একথা বোঝেন না ফলে অনেক সময় তাদের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকা চরিত্রগুলি রক্ত মাংসের জীবন্ত চরিত্র না হয়ে নির্জীব অপ্রকৃত এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। ভবভূতির উত্তরচরিত নাটকে সীতা বিসর্জন কালে রামের বিলাপের সঙ্গে বাল্মীকির রামায়ণের রামের বিলাপের পার্থক্যটি আমাদের দৃষ্টিগোচরে এনেছেন। ভবভূতি রামের চিত্তে যখন যে ভাব এসেছে তৎক্ষণাৎ তা লেখনীর দ্বারা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বক্তব্য ও অবক্তব্য উভয় সীমাতেই যাতায়াত করেছেন, গীতিকবির অধিকারে অনধিকার প্রবেশ করেছেন। ফলে নাট্যকারের যা কাজ তা অবহেলিত হয়েছে। অন্যদিকে বাল্মীকি শুধুমাত্র রামের কার্যকলাপই বর্ণনা করেছেন এবং সেই কার্যকলাপের জন্য যতটুকু ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন ততটুকু বলেছেন। ফলে মহাকাব্যের গাম্ভীর্য পুরোমাত্রায় রক্ষিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র অন্য একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটিকে স্পষ্টতর করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন ভবভূতির উত্তরচরিতও নাটক আর শেক্সপীয়ারের ওথেলোও নাটক। অথচ দুটি নাটকের কতই না পার্থক্য। তিনি ভবভূতিকৃত রামবিলাপের সঙ্গে 'ওথেলো' নাটকে ওথেলো কর্তৃক আপন প্রণয়ী দেসদিমোনার হত্যার পর অনুশোচনার জর্জরিত ওথেলোর বিলাপের তুলনা করেছেন। শেক্সপীয়র এমন কোন কথা ওথেলোর

মুখে ব্যক্ত করেননি যা তৎকালীন কার্যকলাপে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বক্তব্যের বাইরে অবক্তব্যের দিকে তিনি ধাবিত হননি। অন্যদিকে ভবভূতি রামচন্দ্রের হৃদয় অনুসন্ধান করে যেখানে যত ভাব ফুটে উঠেছে তা একে একে সাজিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ফলে রামের বিলাপের বাড়াবাড়ি হয়েছে, আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে রামের মাহাত্ম্যও খর্বিত হয়েছে। অথচ সকলেই স্বীকার করবেন যে, শেক্সপীয়ার ওথেলোর মুখে যে দুঃখ ব্যক্ত করেছেন তা ভবভূতির রামচন্দ্রের দুঃখ থেকে সহস্রগুণ অধিক। পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, নাটকে হৃদয়ের উচ্ছাস থাকতে পারবে না তা নয়। কিন্তু নাটকের তা উদ্দেশ্য নয়। হৃদয় উচ্ছাস বা ভাবোচ্ছ্বাস একান্তভাবেই গীতিকাব্যের বিষয়, সেখানে নাট্যকার হাত বাড়াতে পারেন না।

৪.২ লক্ষ্য

১. বাহ্যত প্রধান অথচ গৌণ উদ্দেশ্য

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নবীন চন্দ্র সেনের রচিত খণ্ডকবিতার সংকলন গ্রন্থ ‘অবকাশরঞ্জিনী’-র রিভিউ বা সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২. অপ্রত্যক্ষ অথচ মুখ্য উদ্দেশ্য

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকে যে আধুনিক পাশ্চাত্য ধাঁচের গীতিকবিতার জোরকদমে চর্চা চলছিল তারই দিকে লক্ষ্য রেখে পাশ্চাত্য প্রেরণাজাত গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য সন্ধান এবং দেশীয় ধারায় গীতিকবিতার সঙ্গে তার পার্থক্য বিধান।

৪.৩ বিষয়বস্তু

কাব্য কথাটি এদেশে বহু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইতিহাস বন্দিত কাব্য পুরাণ, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি অনেক প্রকরণকেই সাধারণ অর্থে এদেশে কাব্য বলার

রেওয়াজ। Poetry ছাড়াও নাটক (পৃথক genre) কে কাব্যগোত্রে ফেলা খুবই লক্ষণীয় ব্যাপার।

মোটের ওপর কাব্যের তিন শ্রেণিঃ

ক. দৃশ্যকাব্য

খ. আখ্যানকাব্য/মহাকাব্য

গ. খণ্ডকাব্য।

আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য poetry genre-এর অন্তর্গত। দৃশ্যকাব্যের প্রকরণ ধর্ম পৃথক। দৃশ্যকাব্য কথোপকথন (সংলাপ) ভঙ্গিমায় রচিত হয় এবং রঙ্গালয়ে তা অভিনয়োপযোগী। এই দুই বৈশিষ্ট্য কাব্য-প্রকরণ থেকে দৃশ্যকাব্যকে পৃথক করে দিয়েছে। কথোপকথনবিশিষ্ট ও অভিনয়োপযোগী প্রকরণকেই আমরা নাটক বলে জানি। কিন্তু লোকভ্রান্তি এই, সর্বত্র এই বৈশিষ্ট্য মেনেই আমরা নাটককে পৃথক করে থাকি। সত্য এই, ওই দুই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রকরণটিকে কাব্যও বলা হয়ে থাকে। Comus, Manfred,Faust, শকুন্তলা কথোপকথন ভিত্তিতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও এদের কাব্য বলেই সমাদর করা হয়।

গীতিকাব্য ‘গ’ শ্রেণি অর্থাৎ খণ্ডকাব্যের এক প্রকার বিশেষ।

য়ুরোপে জনপ্রিয়তা পাওয়া গীতিকবিতা বা Lyric কবিতা বিষয়ে আলোচনাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। য়ুরোপের অনুকরণার্থে সেই দেশের কোনো আঙ্গিকের অযথা বৈশিষ্ট্য বিচার এখানকার লক্ষ্য নয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই Genre-এর লক্ষণ বিশিষ্ট। বস্তুধর্ম কিছু কবিতায় লক্ষগোচর হচ্ছে বলেই এর প্রবর্তনা।

গীত মানুষের স্বভাবজাত। স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই হল সঙ্গীত । মনের গতিশীল ভাবকে প্রকাশ করার জন্যই গীতের প্রয়োজন। যেহেতু অর্থযুক্ত বাক্যের সাহায্য ছাড়া মনোভাব ঠিকমত প্রকাশ পায় না, তার স্বরবৈচিত্রের সঙ্গে অর্থযুক্ত বাক্যের সংযোগ সাধনের মধ্য দিয়ে গীত উৎপন্ন হয়।

স্বরাচাতুর্য ও ভাব চাতুর্যের আদর্শ সহাবস্থান সর্বত্র এক পাত্রে অর্থাৎ এক ব্যক্তিতে সম্ভব হয় না। যিনি গায়ক তিনিই সুকবি এরূপ মাহেন্দ্রযোগ বিরল দৃষ্টান্ত।

অতএব দুই দায়িত্ব দুই পৃথক ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া ধরেই আর্বিভূত হয়েছে গীতিকবিতা। গীত হওয়াই ছিল আদিম উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, গীত না হলেও ছন্দোবিশিষ্ট রচনা আনন্দদায়ক, 'তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।'

'অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাকাব্য, হেমচন্দ্রের খণ্ডকবিতা ইত্যাদির মতো অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।'

মানুষের সুকুমার ভাববৃত্তির ব্যক্ত অংশ নাটকের ক্রিয়া ও কথার মধ্যে ধরা দেয়। আর তার অব্যক্ত অংশের ওপর কেবল গীতিকবিতার অধিকার। মহাকবি ও নাট্যকারেরা অনেক সময় একথা না বুঝেই অহেতুক অব্যক্ত অনুভূতি নিয়ে টানা-হেঁচড়া করেন, তাতেই অনেক সময় অযথা বিপত্তি ঘটে। যেমন, সীতা-বিসর্জনকালে রামের উদগত বেদনার প্রতিটি মুহূর্তকে (যা অব্যক্ত তাও) ভবভূতি ধরার চেষ্টা করেছেন। ফলে রামের কার্যানুরূপ আচরণকে ছাপিয়ে বিলাপ অংশ ভারাক্রান্ত করে তুলেছে দৃশ্যটিকে। এর ফলে বিতর্কও তৈরি হয়েছে অনেক বেশি পরিমাণে। অথচ বাল্মীকি রামের আচরণীয়তার সীমারেখাকে একবারও অতিক্রম করার চেষ্টা করেননি।

অনুমেয় এই যে, অনুভূতির ব্যক্ত অংশ সর্বদা ক্রিয়ানুসারী, ক্রিয়া বা কার্য অনুবাদ করে না নাটকে এরূপ স্বততাৎসারিত অনুভূতির প্রকাশ গীতিকাব্যের এক্তিয়ারে অযথা হস্তক্ষেপের সামিল। অব্যক্ত অংশ কেবলমাত্র 'আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়'। সে অংশ সম্পূর্ণভাবে ক্রিয়ামুক্ত, কেবলই উক্তিমাত্র, বাচিক।

৪.৪ প্রতিপাদন

কোনো পরিষ্কার প্রতিপাদ্যতা নেই এই প্রবন্ধে। নাটক-গীতিকাব্যের দৃষ্টান্তমূলক তুলনায় অকস্মাৎ শেষ হয়েছে প্রবন্ধটি। আলোচনা 'অবকাশরঞ্জিনীর সৃষ্টি-বিশিষ্টতায় আর ফেরেনি । সমকালীন গীতিকাব্য চর্চায় কোনো পরিপ্রেক্ষিতও আসেনি আলোচনার মধ্যে।

৪.৫ গীতিকাব্য সমালোচনার দৃষ্টিকোণ

ক. নূতন genre ভিত্তিক আলোচনা।

বিদেশি আঙ্গিক-প্রকরণের মূল আলোচনাটিকে প্রতিপন্ন করে তোলা হয়েছে। অন্যান্য genre-এর প্রতিতুলনায়। ভিন্নজাতীয়ের সঙ্গে প্রতিতুলনায় অনেক সময়ে লক্ষ্যবস্তুর স্বভাবধর্মকে অভিব্যক্ত করে তোলা যায়। এই পদ্ধতির

বিশ্বস্ত সযত্ন অনুসরণ লক্ষণীয়।

খ. দেশীয় কাব্য ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তুলনা।

এ ধরনের আলোচনা এ প্রসন্ধে অবধারিত ছিল। কারণ ভারতীয় সাহিত্যে গীতিকাব্যের এক নির্দিষ্ট ঘরানা ছিল এবং তা ছিল সর্বত্র গীতাত্মক। পুরানো গেয় কাব্য কিভাবে প্রয়োজনে পৃথক হল এবং আধুনিক গীতিকাব্যের জমি প্রস্তুত হল তার সূচক বিশ্লেষণ রয়েছে এই প্রবন্ধে। অগেয় গীতিকাব্যের উদ্ভাবনার ধারণাটি খুবই সুসঙ্গত।

গ. দৃষ্টান্ত ব্যবহারে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় কাব্যের সমানুপাতিক পদ্ধতিটি

সমালোচকের জ্ঞান বিস্তারের (breadth of criticism) হদিশ দেয়।

৪.৬ অল্প কিছু অপূর্ণতা

এটিকে আস্তরণ-সমালোচনার নমুনা বলা যেতে পারে। তাই এ আলোচনার অন্তর্ভেদ আশা করা অন্যায়। কেবল genre পরিচিত ছাড়া আর কিছু লভ্য নয় এখানে। 'বুক-রিভিউ' বলেই এর এ ধরনের সংক্ষিপ্ততা ও সীমাবদ্ধতা। ব্যক্তিরচনা লক্ষ্য হওয়ায় (নবীনচন্দ্রের কাব্য) ব্যক্তি-অবদানের কিছু উল্লেখ বাঞ্ছনীয় ছিল।

৪.৭ অনুশীলন

১।বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্য কে কোন শ্রেণীর কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন? তিনি যে ভাবে গীতিকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করে নাটক ও মহাকাব্যের সঙ্গে তার পার্থক্য দেখিয়েছেন তা আলোচনা করো।

২।গীতের যে উদ্দেশ্য যে কাব্যে সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য আলোচনা করো।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত- বঙ্কিমচন্দ্র ১৯২০

অজরচন্দ্র সরকার -বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য -বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

অলোক রায় -প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ মন

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়- সমালোচনা রূপরেখা,বঙ্কিম পর্ব

প্রমথনাথ বিশী- সাহিত্যচিন্তা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একক ৫ - বঙ্গাদেশের কৃষক

বিন্যাসক্রম

৫.১ বঙ্গাদেশের কৃষক এর সাধারন আলোচনা

৫.২ লক্ষ্য

৫.৩ বিষয়বস্তু

৫.৩ প্রতিপাদন

৫.৪ সমালোচনার দৃষ্টিকোণ

৫.৫ অনুশীলনী

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ বঙ্গাদেশের কৃষক এর সাধারন আলোচনা

‘বঙ্গদেশের কৃষক’ চারটি শিরোনাম যুক্ত পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত দীর্ঘ প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার চাষিদের দুরবস্থার কারণ ইতিহাস প্রাকৃতিক কারণ, সমাজব্যবস্থা, শাসনপ্রণালী, বিচারব্যবস্থা —এই সব দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।প্রবন্ধটির প্রথম পরিচ্ছেদের নাম ‘দেশের শ্রীবৃদ্ধি’। সমকালের ইংরেজ - শাসিত ভারতে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া হসভ্যতার সংবজনিত দেশের উন্নতির আংশিকতা এ অংশে ব্যাখ্যাত হয়েছে। রেলওয়ে, বাষ্পীয় পোত, টেলিগ্রাফ উন্নত চিকিৎসাশাস্ত্র, নগরস্থাপন, পথ - নির্মাণ, বিজ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যের উন্নতি হয়েছে ইংরেজ শাসিত ভারতে – এ সত্য অবশ্য

স্বীকার্য। কিন্তু সে উন্নতির ফল ভোগ করছে সামান্য সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি। বাংলার সাধারণ মানুষ বিশেষত মিদের অবস্থা বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয়নি। তাদের জীবনধারনের ন্যূনতম উপকরণ যেমন নেই তেমনই নেই উপযুক্ত কষি উপকরণ। তাদের আত্যন্তিক শ্রমে উৎপন্ন ফসল দখল করে জমিদার। অভাবের সুযোগে মহাজন তাদের আবদ্ধ করে ক্ষণজালে। শিক্ষাবিস্তার বা ইংরেজ - শাসন - দেশের এই গরিষ্ঠ জনতার দুর্গতির অবসান করতে পারেনি।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে দেশ থেকে দূর হয়েছে দস্যু তস্করের ভয়, রাজপুরুষ কর্তৃক প্রজার ধন অপহরণের ভীতি। সঞ্চিত অর্থ ভোগ ও উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যাওয়ার আশ্বাস পাওয়া গেছে বলেই সাধারণ মানুষ অর্থ সঞ্চয়ের উদ্যোগী হয়েছে। পরিবার প্রতিপালনের নিশ্চিন্ততা হেতু বিবাহেচ্ছা বর্ধিত হয়েছে। ফলে জনসংখ্যা বেড়েছে। বর্ধিত জনসংখ্যার কারণে অধিক খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে কুষিজমির পরিমাণ বেড়েছে।

ব্রিটিশ ভারতের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য চাল, রেশম, কার্পাস, পাট, নীল প্রভৃতি কৃষিজ পণ্য। এইসব পণ্য উৎপাদনের কারণেও চাষের পরিমাণ বেড়েছে। একারণে দেশের ধনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি দেশের দুরবস্থার প্রমাণ নয় — দ্রব্যমূল্য বাড়ার তাৎপর্য অর্থমূল্য হ্রাস এবং কুষিজ বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি। অর্থাৎ কৃষি হয়ে উঠেছে ধনের ক্রমবর্ধমান উৎস। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কৃষিপণের আয় তিন-চার গুণ বেড়ে গেছে। এই বর্ধিত ধনের কিছু অংশ যায় শাসক-ভাণ্ডারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে ইংরেজ সরকারের তৌফির বন্দোবস্ত বাতিল করা মুসলিম শাসনকালে প্রদত্ত লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করা; নদীতে চর পড়ার ফলে সৃষ্ট ভূমির কর, জমিদারের নিজস্ব চাষজমি খাসমহলের করবৃদ্ধি এবং অফিম প্রভৃতি শুকযোগ্য কৃষিজ দ্রব্যের কর প্রভৃতি কারণে সরকারের ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮৭০ - ১৮৭১ সালের কলকাতা রেভিনিউ বোর্ড এর বিজ্ঞাপনীতে কার্যাধ্যক্ষ শক সাহেব এই বর্ধিত অরে হিসেব দিয়ে লিখেছেন কর্ষণ-লব্ধ এই সম্পদের অধিকাংশ

পায় বণিক এবং মহাজন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এ তথ্য ভ্রান্ত। এবং সমকালের পত্রিকা ইকনমিস্ট এই ভুল করেছিল 'ইন্ডিয়ান অবজারভার' তা অপনোদন করেছে। প্রকৃত তথ্য এই যে যদিও চাষির সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মহাজনের সংখ্যা বেড়েছে এবং ফসল বিক্রয়ের মাধ্যমে বণিকের লাভের পরিমাণ কিছু বর্ধিত হয়েছে তথাপি বলা যায় না যে বর্ধিত কৃষি - সম্পদের অধিকাংশ তারা পায়।

বর্ধিত কৃষি - জাত ঐশ্বর্যের অধিকাংশ পায় জমিদার। ভূমিতে প্রামশ বেশির ভাগ চাষির কোনো স্থায়ী অধিকার নেই। কিছু কৃষকের জমিতে আইনি অধিকার আছে। কিন্তু জমিদার ইচ্ছা করলে তাদের উচ্ছেদ করে অধিক খাজনার বিনিময়ে অন্য প্রজাকে জমি চাষের অধিকার দিতে পারে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাষের জমির দাবিদারের সংখ্যাও বেড়েছে। তাই জমিদার সর্বাধিক জনা দিতে সমর্থ চাষিকে জমি চাষের অধিকার দেয়। ফলে জমিদারের আয় বাড়ে কিন্তু চাষির দুর্দশা যায় বেড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এভাবেই বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দশা বর্ধিত হয়েছে।

আইন – আদালত এর কোনো প্রতিকার করতে পারেনি। আইনকে স্বয়ং বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র 'তামাসা' বলে অভিহিত করেছেন। এবং জমিদারের 'দয়াধর্ম' বিষয়ে তার বক্তব্য যখন অত্যাচারের চরম হয় তখনই জমিদারের দল দেখা দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এভাবেই ধাপে ধাপে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন ব্রিটিশ শাসনে বাংলা দেশের সম্পদ বছি পেয়েছে সে সম্পদের উৎস কৃষি। কিন্তু চাষ যারা করে সেই অসংখ্য সাধারণ মানুষের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। শাসক, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন — এদের অবস্থার উন্নতিকে কখনও দেশের শ্রীবৃদ্ধি বলা যায় না। কারণ তারা দেশের জনসংখ্যার অতি সামান্য অংশ।

এই প্রবন্ধের 'জমীদার' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন জীবজগতে বলবান জীব যেমন। দুর্বলকে গ্রাস করে তেমনই শক্তিমান জমিদার শক্তিহীন কৃষককে সর্ব প্রকারে শোষণ করে আপন ধন বৃদ্ধি করে। প্রাণপণ শ্রমে ফসল ফলিয়েও চাষি নুগ্রবৃত্তি করতে হয় অসমর্থ।

মন্তব্য

বঙ্কিমচন্দ্র বলেননি সব জমিদারই শোষক। সৎ, প্রজাবৎসল, ন্যায়বান জমিদারও বর্তমান। এবং জমিদারদের সঙ্গে তার কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতাও নেই। তার বক্তব্যের লক্ষ্য অত্যাচারী জমিদারগণ। বাংলার কৃষকেরা জমি থেকে অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারে না। সেই ফসল থেকে তাকে বীজের দাম, শ্রমিকের বেতন, গোরুর খাোরাক সহ চাষের সব খরচ চালাতে হয়। তারপর বর্ষায় মহাজনের কাছে নেওয়া ঋণ দেড় গুণ সুদ দিয়ে শোধ করতে হয়। অবশিষ্ট সামান্য অংশ থেকে জমিদারের খাজনা মিটিয়ে যে স্বল্প ফসল থাকে তাতে বহু কষ্টে তার দিন চলতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না।

চাষি ধান কেটে পৌঁষে শোধ করে পৌষ কিস্তির খাজনা। কেউ পুরো খাজনা দেয় কারও বা কিছু বাকি থাকে। ধান ঝাড়াই করে গোলায় তুলে হাটে বিক্রি করার পর চাষি সারা বছরের খাজনা মেটাতে যায় জমিদারের কাছারিতে। সেখানে গোমস্তার হিসেবে দেখা যায় তার পৌষ কিত্তির খাজনা বাকি। যদিও চাষি পৌষ কিস্তির জন্য অনেকটাই দিয়েছে; কিন্তু তার কোন রসিদ বা দাখিলা হয় সে পায়নি নয় তাতে টাকার পরিমাণ কম দেখানো হয়েছে। চাষির বক্তব্য সেখানে হয় উপেক্ষিত। সে বাধ্য হয় গেমার মিথ্যে হিসেব মেনে নিতে। নতুবা তার পুরো খাজনা দেওয়ার রসিদ ('আখিরি কবচ') সে পায় না। তার চেয়ে বড়ো বিপদ গোমস্তার হিসেব না মানলে করের পরিমাণ বাড়িয়ে নালিশ করবে গোমস্তা। এরপর আসে বিবিধ বাড়তি কর – 'নিরিখ' বা বাকি খাজনার সুদ; গোমস্তা খাজনার হিসেব করার জন্য আদায়। করে হিসাবানা, কাছারির সকল কর্মচারী নায়েব থেকে পাইক – সকলকে দিতে হয় পার্বনি।

জমিদারের ইচ্ছায় এই সব কর আদায় করা হয় না এবং তিনি ন্যান্য খাজনা ও তার সুদ ভিন্ন কিছুই পান না। এই সব করের অর্থ পায় কর্মচারীগণ। কিন্তু জমিদার এ বিষয়ে দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কারণ তিনি কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন দেন না। দারোয়ান আর নায়েলের বেতন সমান। জমিদারের গোমস্তার বেতন তার খানসামার চেয়ে কম। তা ছাড়া তিনি এ সব অন্যায় কর আদায়ে বাধা দেন না। কারণ এতে তার অর্থব্যয় কমে।

চৈত্র কিস্তির পরে আসে আষাঢ় মাসে নতুন বছরে খাজনা দেওয়ার দিন পুণ্যাহ। ওই দিন জন ভিন্ন নিলে তা নয়। সরিকান জমিদারির প্রজাদের প্রতি সন্নিককে পৃথক 'নজর' প্রদান করতে হয়। তা ভিন্ন কর্মচারী আছে নকালে নত অর্থাভাবে কোনো প্রজা সবার নজর না দিতে পারলে তাদের দেয় টাকা বাকি রলে হিসেব করা হয় এবং তা লৰে দান করা হয়।

চাষি সব কর মিটিয়ে শূন্য হস্তে ঘরে গিয়ে আহান সংস্থান ও চাষের খরচের জন্য মহাজনের নিকট দেড়া সুদে টাকা ধার করে। আগামী বছরে তা শোধ করে। অনেক স্থানে জমিদারই মহাজন। প্রজার ফসল হরণ করে তাকেই তিনি এনে দিয়ে দেড়া সুদে তা আদায় করেন। যত তাড়াতাড়ি তিনি প্রজার কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে পারবেন ততই তাব লাভ।

সব বছর সমান ফসল হয় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কীটাদির উপদ্রবে বিঘ্নিত হয় ফলন। সে ক্ষেত্রে মহাজন ঋণ দেয় না। কারণ ফসলই কৃষকের একমাত্র সম্পদ। নিরুপায় চাষি তখন হয় অন্নাভাবে সপরিবারে মারা যায় নতুবা রিলিফ, ভিক্ষা, অখাদ্য ভক্ষণের দ্বারা কোনো মতে টিকে থাকে। খুব কম জমিদারই এ সময় চাষিকে সাহায্য করেন। অর্থাৎ সুবৎসরে চাষির জীবন চলে ঋণ করে; দূর্বৎসরে তারা অসীম যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়।

পরিণামে ভাদ্রের কিস্তি অর্থাৎ ভাদ্র মাসে প্রদেয় খাজনা সে দিতে পারে না। জমিদারের কাছারি থেকে খাজনার তাগাদা দিতে আসে পাইক, পেয়াদা, নগদি, কোটাল, হালশাহানা – নামের বিভিন্ন কর্মচারী। কেউ কেউ আদায়ের ব্যবস্থা করতে না পেরে চলে যায়। অনেক সময় চাষি ধার করে খাজনা দেয়। কদাচিৎ সে পেয়াদার সঙ্গে খাজনা না দেওয়া সম্পর্কে তর্ক করে। তখনই সে গোমস্তার হুকুমে দুর্ব্যবহারের অপরাধে কাছারিতে আনীত হয়। সেখানে গালাগালি, শারীরিক শাস্তির পর তাকে কয়েদ করা হয়। হিতৈষী কেউ খাজনা শোধ করে তাকে মুক্ত করে। নতুবা চাষি বন্দি থাকে। এবিষয়ে থানায় নালিশ করে ফল হয় না। কারণ আগত কনস্টেবল গোমস্তা প্রদত্ত অর্থলাভে তুষ্ট হয়ে থানায় ফিরে গিয়ে জানায় কয়েদ করার নালিশ মিথ্যা।

খাজনা বাকি রাখা ভিন্ন আরও নানা কারণে চাষি কয়েদ হয়। যে কেউ গোমস্তাকে অর্থে বশ করে যে কোনো অভিযোগে চাষিকে কয়েদ করে নানা শাস্তি দেওয়াতে পারে। জমিদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলেও তাকে শাস্তি পেতে জমিদার গৃহের বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে চাষিকে দিতে হয় জমিদারের জারি করা নির্দিষ্ট অর্থের মাঙ্গন' নামক কর। সে করের কিছু অংশ ব্যয় হয়, বাকি জমা হয় জমিদারের ভাণ্ডারে।

মহাল পরিদর্শনে আগত জমিদারকে টাকা ভিন্ন দিতে হয় ফলমূল, শাকসবজি, মাছ - মাংস। এ উপলক্ষ্যে। চাষিদের উপর চাপানো হয় 'আগমনী', 'নজর' বা 'সেলামি' নামের কর। এসব কর না দিতে পারলে পূর্বের মতো চাষি কয়েদ বা দেনা বাকির সামিল হয়। আদালতে নালিশ করে পেয়াদার সাহায্যে এ জন্য তার ফসলও ক্রোক করে জমিদার।

সর্ব বিক্রয় করে টাকার জোগাড় করে চাষি হয়তো এরপর সুবিচারের জন্য আদালতে যায়। কিন্তু জমিদার তার বিরুদ্ধে ক্রোক অমান্য করে ধান কেটে বিক্রির নালিশ জানায়। ভীত অন্য প্রজাদের সাক্ষ্য এবং অর্থবলে জমিদার জয়ী হয়। চাবি 'ক্রোক'-এর ক্ষতিপূরণ এবং দুটি মোকদ্দমার (ক্রোক ও নালিশ) খরচ জমিদারকে দিতে বাধ্য হয়। এর উপর আছে তার নিজের দুটি মামলার খরচ। চাবি এবার অর্থের জন্য জমি বিক্রয় করে অথবা জেলে যায় নতুবা দেশত্যাগ করে।

জমিদারের অত্যাচারের নিদর্শন হিসেবে 'অবজারভর সাময়িক পত্রে ৩১ ।৮।১৮৭১ -এ মুদ্রিত একটি সত্য ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র বিবত করেছেন। বঙ্গাব্দ ১২৭৮ - এ বন্যাপীড়িত এক গ্রামের বারো-চোঙ্গো জন প্রজা ও বারো-চোদ্দো। জমা কৃষিশ্রমিকের নিকট থেকে গোমস্তা জোর করে মোট আঠারো দফা খাজনা আদায়ের জন্য উপস্থিত হয়। সেই সব করের মধ্যে 'নজর' থেকে 'পার্বনি' - সবই ছিল; ছিল 'ডাক টেক্স' নামে ডাকের খরচ আদায়ের কর। বন্যাবিপন্ন গ্রামের চাষিদের ঋণ করে সেই টাকা দিতে হয়। এর চার-পাঁচ দিনের মধ্যে জমিদারের মেয়ের বিয়ের খরচের জন্য চল্লিশ টান। আদায়ের হুকুম নিয়ে আবার আসে পেয়াদা। ফসলের অবস্থা জন্য নীলকুঠির সাহেব বা মহাজন — কারোর কাছে মেলে না ঋণ। উপায়হীন চাষিরা জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে

ফৌজদারি আদালতে নালিশ করে। নিম্ন আদালতে শাস্তি প্রাপ্ত জমিদারপক্ষ আপিলে মুক্ত হয়। এরূপ ঘটনার আধিক্যই সাধারণত লক্ষিত হয়। সরকারকে দেয় করব টাকাও জমিদারগণ প্রজার কাছ থেকেই আদায় করে। সরকারের নির্দেশ মফসসলে ডাক চলাচলের খরচ জমিদার দেবেন। জমিদার সেজন্য প্রজার উপর চাপান ডাক ট্যাক্স এবং প্রজার দেয় অর্থের পরিমাণ এভাবে স্থির করেন যে সরকারকে টাকা দিয়েও তার কিছু লাভ থাকে। আয়কর, খাসমহল মালিকদের প্রদেয় রোড ফন্ড – সবই প্রজাদের কাছে থেকে। একই নিয়মে আদায় হয়। নিয়মানুযায়ী জমিদার টাকায় এক পয়সা হিসেবে রোড সেস আদায়ে সক্ষম। কিন্তু জনৈক জমিদার টাকায় চার আনা হিসেবে ওই কর আদায় আরম্ভ করেন। অবশ্য এক নিপীড়িত প্রজার আদালতে নালিশের ফলে জমিদারটি দণ্ডিত হন। 'হাসপাতালি' নামক কর নির্ধারণের একটি সত্য ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করেছেন। চকিত্বশ পরগনার কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্বীয় সাব ডিভিশন-এ ডিসপেনসারি স্থাপনের জন্য স্থানীয় জমিদারদের নিয়ে একটি সভা করেন। সভায় সব জমিদারই এজন্য মাসিক অর্থদানে স্বীকৃত হন এবং স্বস্থানে গিয়ে প্রজাদের উপর টাকায় এক আনা হিসেবে 'হাসপাতালি' নামে কর বসান। পূর্ণ উদ্যোগের অভাবে ডিসপেনসারি স্থাপিত না হওয়ায় । জমিদারদের কোনো টাকা দিতে হয় না। কিন্তু 'হাসপাতালি' আদায় চলতেই থাকে। উপরন্তু কয়েক বছর পরে এই করের দুষ্টান্ত দিয়ে জমিদার ১৮৫৯ সালের দশ আইন অনুযায়ী আদালতে বাজনা বাড়াবার আবেদন জানান।

বঙ্কিমচন্দ্র এরপর জমিদার পক্ষের সমর্থনে কিছু কথা বলেছেন। প্রথমত সৰ জমিদার অত্যাচারী ননন এবং অত্যাচারী। জমিদারের সংখ্যা ক্রমে কমছে। কলকাতাবাসী সুশিক্ষিত জমিদার বা বড়ো জমিদারির মালিকেরা অত্যাচারী নন। তাদের মতের বিরুদ্ধে তাদের না জানিয়ে অত্যাচার চালায় নায়েব-গোমস্তা কর্মচারীবৃন্দ। মূলত ছোটো জমিদারবৃন্দ এবং পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, ইজারাদারগণ অধিক অত্যাচারী হন। আয় কম হওয়ায় ক্ষুদ্র জমিদারগণ অধিক অর্থ আদায়ে মনোযোগী হন। ইজারাদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিাদারশাণ জমিদারের খাজনা দিয়ে স্বয়ং লাভ করার লক্ষ্যে প্রজাদের

নিকট যতটা সম্ভব অধিক অর্থ আদায় করেন। জমিদার বলতে তিনি করগ্রাহী শ্রেণীকেই বুঝিয়েছেন। তার মতে চাষিদের নিপীড়নের। তথা বর্ধিত কর আদামের কারণ তিনটি =

(১) পত্তনি, দরপত্তনি, ইজারা - এই সব মধ্যবর্তী তালুক সৃষ্টি ।

(২) অনেক সময়ে জমিদারদের না জানিয়ে তাদের মতের বিরুদ্ধে চলে এইসব অত্যাচার।

(৩) অনেক সময় দুর্বিনীত প্রজাশাণ পীড়ন ব্যতীত আজনা দেয়না। অবশ্য একথাও বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে। বিনা নিপীড়নে প্রজারা বিরোধী হয় না।

এরপরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন প্রজাহিতৈষী জমিদারও আছেন। এবং এই সৰ সহায় জমিদারের দলট । বাংলায় শিক্ষা বিস্তার, চিকিৎসা ব্যবস্থা, অতিথি সৎকার বিধি ও যোগাযোগ সহজ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে জিতলেন সর্বাপেক্ষা মহান কাজ "ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন" স্থাপন করে দেশীয়দের মঙ্গলার্থে পরদেশীয় শাসন বলছেন, সামান্য আন্দোলন করা। এরূপ কাজ অন্য কোনো সম্প্রদায় করেনি, করা সম্ভবও নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে স্ব-শ্রেণির মধ্যে নিন্দা বা অপযশের ভয় অনেক দুর্বত্তকে পাপ কর্ম থেকে বিরত করে। অতএব জমিদাররা বিশেষত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামক জমিদার-সমিতিই অত্যাচারী অসৎচরিত্র জমিদারদের দমন করে দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধনে সক্ষম। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সশিক্ষিত, তীক্ষবুদ্ধি, বহুদর্শী জমিদারগণের সমিতি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন যদি ঐ কাজ না করেন তবে তাদের যশ ম্লান হবে।

'বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধটির প্রাকৃতিক নিয়ম' নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য ভারতবর্ষের প্রকৃতিই কালো তথা ভারতের কৃষক এবং সাধারণ মানুষের দুর্দশার উৎস। হিন্দু রাজত্বেও তাদের উপর চলত অত্যাচার।

আলোচনার প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র বকল-এর নাম করেছেন। বকল (Henry Thomas Buckle:১৮২১-১৮৬২) সভ্যতার ইতিহাস রচয়িতা হিসেবে প্রসিদ্ধ। বল প্রমাণ

করেছেন জ্ঞানের বিকাশই সভ্যতার মূল এবং সভ্যতা- ব্যাপ্তির কারণ; বঙ্কিমচন্দ্রও তা স্বীকার করেন।

প্রয়োজনীয় শ্রম এবং অবকাশ ভিন্ন আনলাভ অসম্ভব। জীবনধারণের জন্য প্রথম প্রয়োজন খাদ্য। কিন্তু খাদ্যের সন্ধানে যদি সমাজের সব মানুষ ব্যস্ত থাকে তবে জ্ঞান চর্চার সময় থাকে না। একারণে সভ্যতার উদ্ভব ও অগ্রগতির জন্য দরকার শ্রেণি বিন্যস্ত সমাজ। এক শ্রেণির মানুষ কেবল বিদ্যালোচনা করবেন তথাপি তাদের বেঁচে থাকার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কোনো কিছুর অভাব হবে না। এ অবস্থায়ই জ্ঞানের সমুন্নতি সম্ভব। এরূপ পরিবেশ তখনই সম্ভব যখন শ্রমজীবীগণ স্বীয় প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক ফসল ফলাতে সমর্থ হয়। সেই অতিরিক্ত ফসল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা যায় বলেই বিদ্যাজীবী সম্প্রদায় বিনা বিঘ্নে জ্ঞানালোচনা করতে পারেন। উৎপাদকের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উৎপাদনকে বলা হয় সঞ্চয়। এই সামাজিক ধনসঞ্চয় ভিন্ন সভ্যতার অগ্রগতি অসম্ভব। সামাজিক ধনসঞ্চয় সব দেশে হয় না। যে দেশ সামাজিক ধনসঞ্চয়ে সমর্থ হয় সে দেশেই সভ্যতার সূচনা ও উন্নতি হয়।

সামাজিক ঐশ্বর্য সঞ্চয় নির্ভর করে ভূমির উর্বরতা ও জলবায়ুর উপর। উষ্ণ দেশের বাসিন্দাগণের আহারের পরিমাণ কম। শীতল জলবায়ুর দেশের মানুষের প্রয়াোজন অধিক আহার। ফলে উষন্ন দেশে উৎপাদিত ধন সহজে সঞ্চিত হতে পারে।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র বকল - এর অনুসরণে এই আবহনির্ভরতার ফলাফল ব্যাখ্যা করেছেন। বকল - এর মতে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের অধিবাসীদের শারীরিক তাপ বৃদ্ধিকারক খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই; সে প্রয়োজন আছে শীতল দেশের বাসিন্দাদের। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দেহ কার্বনের সঙ্গে শ্বাসবায়ুর অম্লজানের(অক্সিজেন) রাসায়নিক মিলনের ফলে শরীরতাপ বৃদ্ধি পায়। মাংসের মতো কার্বনসমৃদ্ধ খাদ্য দেহতাপ বাড়ায়। তাই শীতপ্রধান দেশের আহার্য মাংসপ্রধান এবং বীজ প্রধান দেশের আহার উদ্ভিজ বহুল হয়। উদ্ভিজ - খাদ্য সহজলভ্য; পশুবধ শ্রমসাধ্য, ভোজ্য পশু দুর্লভ; তাই প্রাণীজ খাদ্য সহজলভ্য নয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আহার্য সুলভ্য হওয়ায় সামাজিক ধন সন্ধায় দ্রুত হয়। আবহের উষ্ণতা এবং ভূমির ভবরতা হেতু ভারতে সহজে এবং

দ্রুত সামাজিক ধন সঞ্চিত হয়েছিল। ফলে সমাজের একটি শ্রেণি অর্থাৎ ব্রা সম্প্রদায় দৈহিক শ্রম না করে জ্ঞানের আলোচনা করার সুযোগ পান। ব্রাহ্মণদের অর্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের ভাবনা ভারতে প্রথম সভ্যতার উদয় হয়। কিন্তু সভ্যতার এই আদি অভ্যুদয়ই ভারতীয় শ্রমজীবীদের তথ্য প্রজাগলের দুর্দশার

ধন সঞ্চয়ের ফলে সমাজ শ্রমজীবী এবং শ্রমহীন চিন্তাজীবী — এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়। শ্রমজীবীদের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্য বিদ্যাজীবীদের শরীর পোষণের উৎস। ফলে প্রাপ্ত অবসরের কারণে চিন্তা ও শিক্ষার দ্বারা বিদ্যাজীবীদের বুদ্ধি হয় মার্জিত। পরিণামে তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা যায় বেড়ে। তারা সহজেই সমাজ-শাসনের অধিকার পায় শ্রমজীবীদের কাজ করতে হয় এদের অধীনে। অবশ্য বিদ্যাজীবীদের জ্ঞান ও বুদ্ধি শ্রমিকদের কিছুটা উপকার করে। তার। মূল্য হিসেবে এরা পায় উৎপাদিত ধনের বাড়তি ভাগ। এভাবে সমাজের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য তাদের হাতে জমতে থাকে। শ্রমজীবীরা দেশের উৎপন্ন সম্পদ পায় শ্রমের মূল্য হিসেবে। ব্যবসায়ের মুনাফা (জমির খাজনা ও সুদ এর মধ্যে পড়ে। বুদ্ধিজীবীদের প্রাপ্য। সংখ্যায় বেশি হলেও শ্রমজীবীগণ বেতন ভিন্ন মুনাফার অংশ পায় না। তাই সংখ্যাধিক্য শ্রমজীবীদের দুর্দশার উৎস। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে দেশের ধন বাড়তে থাকলে শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতি হত। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় তাই হয়েছে। ভারতে জনসংখ্যা বাড়লেও দেশের অর্থাৎ সমাজের ধন বাড়েনি।

জনবৃদ্ধি জনিত দুর্দশা রোধের দুটি উপায় আছে –

(১) জনবহুল দেশের বাসিন্দাদের জনবিরল দেশে বসতি স্থাপন। ইংল্যান্ড এজন্যই আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তার ফলে উপনিবেশেরও মঙ্গল হয়েছে।

(২) বিবাহপ্রবণতা রোধক বঙ্কিমচন্দ্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। এটিকে পরিবার। পরিকল্পনার আদি রূপ বলা যায়। বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য সন্তানলাভ। অতএব কিছু মানুষ অবিবাহিত থাকলে লোকসংখ্যা সীমিত থাকে। যে দেশের মানুষ স্বচ্ছন্দ জীবনে অভ্যস্ত, যেখানে কঠোর শ্রমে বহুল জীবনোপকরণ

সংগ্রহ। করা আবশ্যক; সে সব দেশের মানুষ পরিবার প্রতিপালনের উপায় স্থির না হলে বিবাহ করে না।

ভারতবর্ষে এ দুই উপায়ের কোনোটিই কার্যকর নয়। কারণ গ্রীষ্মধিক্য হেতু শারীরিক শ্রমে অনীহা ও আলস্য জন্মায়। দেশান্তর যাত্রার মতো উৎসাহ ও প্রয়াসের অভাব হয়। পর্বত ও ঝটিকাসংকুল সমুদ্র-বেষ্টনীর জন্য ভিন্ন দেশ গমনের মতো প্রাকৃতিক অনুকূলতাও থাকে না। যবদ্বীপ, শ্যাম, বালি - প্রভৃতি ক্ষুদ্র উপনিবেশ ভারতবর্ষের মতো বড়ো দেশের উপযুক্ত সহায়তা করতে পারে না। সহজে শস্যোৎপাদন, স্বল্প ভোজনে শরীরধারণ, বাহুল্যহীন পরিচ্ছদ – এই তিন কারণে ভারতে তথা বাংলায় পরিবার প্রতিপালন সহজ। তাই বিবাহেচ্ছা দমনের প্রয়াস এ দেশে নেই। পরিণামে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু দেশের সম্পদ বাড়ে না। এইভাবে যে উর্বর ভূমি আর আবহ-উষ্ণতা এদেশে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাবের কারণ তাই শ্রমজীবীদের অবস্থা = অবনতির কারণে পর্যবসিত হয়। সাধারণ সেই অবনমন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। অবস্থা অবনতির কারণে সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের ভেদ প্রবল হয়। ধনবৈষম্য হেতু দেখা দেয় অধিকার-বিষমতা। দীন শ্রমজীবীদের উপর বুদ্ধিজীবীগণের প্রভুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে শুরু হয় অত্যাচার, শুদ্রপীড়নার্থ রচিত হয় স্মৃতিশাস্ত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র এরপর তিনটি সূত্রে আলোচনার সারবস্তু বিন্যস্ত করেছেন।

১) শ্রমজীবীদের অবনতির প্রথম ফল শ্রমের মূল্য হ্রাস; তার ফলে দারিদ্র্য বৃদ্ধি। কম মজুরির জন্য অধিক শ্রমের প্রয়োজন; সে জন্য অবসর হ্রাস এবং শিক্ষার সুযোগ নাশ। অতএব অবনমনের দ্বিতীয় ফুল মুখতা। তৃতীয় ফল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব বৃদ্ধি ও শ্রমজীবী শ্রেণির স্বাধীনতার লোপ অর্থাৎ দাসত্ব।

দারিদ্র্য, মূর্খতা আর দাসত্ব – শ্রমজীবীদের এই তিন দুঃখ ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য স্থায়ী হয়েছে। ধনসঞ্চয় সভ্যতার উৎস। ধনলাভেচ্ছা সভ্যতা বিকাশের কারণ। মানুষের জ্ঞানস্পৃহা ও ধনতৃষ্ণা সামাজিক উন্নতির মূল করণ। প্রথমটিকে মহৎ সম্মানীয় এবং দ্বিতীয়টিকে হীন স্বার্থসূচক মনে করা হয়। কিন্তু হিস্ট্রি অফ র‍্যাশনালিজম ইন ইউরোপ ("History of Rationalism in Europe') গ্রন্থে লেকি (Willian Edward

Hartpole Lecky: ১৮৩৮ - ১৯০৩) বলেছেন দুই কামনার মধ্যে ধনপিপাসা মানবজাতির পক্ষে অধিক শুভকর। কারণ জ্ঞান লিপ্সার তুলনায় ধনতৃষ্ণা অধিক মানুষের মধ্যে লক্ষিত হয়। উৎপন্ন সম্পদে দেশের সব মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা হলেও মোহিক ধনকামনা কমে না। কামনা বৃদ্ধির সঙ্গে দেখা দেয় চেষ্টা; চেষ্টার ফলে আসে সাফল্য। বৃদ্ধি পায় সুখ এবং কাজের সার্বিক মঙ্গল সাধিত হয়। সুতরাং ধনকামনা তথা স্বাচ্ছন্দ্যের কামনার প্রসার সভ্যতার উন্নতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জাগতিক সুখের তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানলাভেচ্ছা, সৌন্দর্যতৃষা, কাব্যসাহিত্য প্রীতি এবং বিভিন্ন বিদ্যা চর্চার। ইচ্ছা জাগ্রত হয়।

প্রাকৃতিক কারণে ভারতীয় সমাজে অনিষ্টকর সন্তোষ লক্ষিত হয়। তাপপ্রধান আবহে দীর্ঘ শ্রম অসম্ভব; তাই দেখা দেয় শ্রমে অনিচ্ছা। শ্রমের দ্বারা দেহতাপ বৃদ্ধির আবশ্যকতা না থাকায় শ্রমের প্রয়োজনও থাকে না। শ্রমের অনিচ্ছা। আর অনাবশ্যকতার ফলে আসে আলস্য আর অনুৎসাহ বা সন্তোষ যা ভারতের অনুন্নতির কারণ।

ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, স্মার্ত, দার্শনিক – সকলেই ঐহিক সুখের মূল্যহীনতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। ইউরোপেও ধর্মর্যাজকগণ জাগতিক সুখের অনুৎকর্ষতা প্রচার করেছিলেন। এ কারণে রোমক সভ্যতার পতনের পর প্রায় হাজার বছর ইউরোপের মানুষের সাধারণ অবস্থার উন্নতি হয়নি। নব জাগরণ সময়ে প্রাচীন ইহমুখীন গ্রিক - রোমান সভ্যতা-সংস্কৃতি - দর্শনের পুনরুত্থানের কারণে ওই জাগতিক সুখে অপ্রবৃত্তি স্থায়ী হয়নি। ভারতে কিন্তু ঐহিক সুখে আসক্তিহীনতার শাস্ত্রীয় নির্দেশ প্রাকৃতিক কারণে মানবস্বভাবে পরিণত হয়েছে। এসব কারণে ভারতে শ্রমজীবীদের দুর্গতি স্থায়ী হয়। আর সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও গৌরব হারায়। কারণ সমাজের নিম্নশ্রেণির অধপতন সমাজের সর্ব শ্রেণির দুর্দশার কারণ।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের চার বর্ণে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) বিভক্ত সমাজে অন্য তিন বর্ণের ক্রমাবনতির আলোচনা করেছেন বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ —এই ক্রমানুসারে, কারণ শূদ্রদের কথা প্রথমেই আলোচিত

ক) বৈশ্য – বৈশ্য অর্থাৎ বণিকদের জীবিকা বাণিজ্য। শ্রমজীবীদের উৎপন্ন দ্রব্যের আধিক্য বাণিজ্যের উৎস। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অধিক উৎপাদনের ফলে উন্নত হয় বাণিজ্য। মানুষের অভাববোধের বৃদ্ধি, ভিন্ন দেশের দ্রব্য লাভের ইচ্ছা বাণিজ্যকে দেয় ব্যাপ্তি। দেশবাসীদের অভাবহীনতা এবং দেশজ বস্তুতে তুষ্টি বাণিজ্যের অবনতি এবং বণিকদের অনুন্নতির কারণ। বস্তুত এই দুই কারণেই ভারতে বাণিজ্যের সম্যক বিকাশ হয়নি। বাণিজ্যের অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রবন্ধে আলোচনা করেননি।

খ) ক্ষত্রিয় তথা শাসকগোষ্ঠী – বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ইতিহাস এই শিক্ষা দেয় যে, প্রজা যদি বলবান ও রাজপ্রতিদ্বন্দ্বী না হয় তবে শাসকশ্রেণির মধ্যে ঔদার্যের অভাব দেখা দেয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ-সম্ভাবনার অভাবে তারা হয়ে ওঠে স্বেচ্ছাচারী ও আত্মসুখপরায়ণ। ইচ্ছানুরূপ কার্যের স্বাধীনতা হেতু শাসকগণের মধ্যে প্রবল হয় কর্তব্যশিথিলতা এবং প্রবণতা।

ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায় তার দৃষ্টান্ত। এদেশের সাধারণ প্রজা দুঃখী, খাদ্যসংস্থানে ব্যস্ত, স্বভাবত সন্তুষ্ট, নম্র, তেজ ও উৎসাহহীন এবং বিরোধ-ভীরু। এ জন্য এদেশের পুরাকালীন বলিষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ, ইন্দ্রিয়জয়ী শাসকগণ হয়ে উঠে দুর্বল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ অকর্মণ্য এবং অবশেষে তারা দেশ শাসনের অধিকারও হারিয়েছে।

শক্তিমান রাজ-অন্যায়ের প্রতিবিধানে সক্ষম প্রজাবর্গ রাজপুরুষদের সংযত থাকতে বাধ্য করে। এই শক্তি- সাম্য জনিত দ্বন্দ্বে উভয় পক্ষেরই মানসিক গুণসমূহ পুষ্ট হয়।

গ) ব্রাহ্মণ বর্গ– ভারতীয় সমাজের উচ্চ শ্রেণিতে ব্রাহ্মণদের অবস্থান। সমাজের নিম্নস্থ তিন শ্রেণির অবনমন। বাহ্মণগণকেও প্রভাবিত করে। তাদের মধ্যেও দেখা দেয় পতনের চিহ্ন। মানসিক দুর্বলতা হেতু অন্য তিন বর্ণের মানুষকে আকর্ষণ করে উপধর্ম। জগৎ শক্তিমান অনিষ্টকারী দেবতার অধীন— এই বিশ্বাসই উপধর্মের মূল লক্ষণ। ব্রাহ্মণ এই উপধর্ম অনুষ্ঠানের কর্তা হওয়ায় তাদের শক্তি বর্ধিত হয় কিন্তু মানস-উৎকর্ষ হ্রাস পায়। একদা ব্রাহ্মণগণ রাজ্য শাসন বিধি, দণ্ডনিয়ম, সন্ধি-বিগ্রহের নিয়ম নির্ধারক শাস্ত্র রচনায় ও তার প্রয়োগে দক্ষ ছিল। অধঃপাতের ফলে সেই ব্রাহ্মণগণ।

জীবনযাপনের প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে অনাবশ্যকবিধি নির্মাণে এবং তার পালনে তৎপর হল।

ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে মানুষকে স্বেচ্ছায় মেনে চলার অতিরিক্ত বিধি পালনে বাধ্য করা সমাজের অবনতির উৎস। হিন্দু সমাজের অবনমনের অন্যতম কারণ এই অতিরিক্ত বিধিনিষেধ। এর ফলে সাধারণ প্রজা আর উর্ধ্বতন শাসক ব্রাহ্মণ — উভয়ের অবস্থাই হয়েছে হীন। রামায়ণ - মহাভারত; পাণিনি ব্যাকরণ, সাংখ্য-দর্শনের স্থলে এসেছে, বাসবদত্তা' কাদম্বরী' প্রভৃতি অলংকারবহুল কাব্য। ক্রমে ব্রাহ্মণ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সামাজিক নিয়ম সংক্রান্ত শাস্ত্র সংহিতাসমূহ প্রণয়নে তার মানসশক্তি নিয়োজিত হয়েছে। অধ্যায় শেষে বঙ্কিমচন্দ্র আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন। তার মতে উর্বর ভূমি আর উষ্ণ আবহ ভারতে সভ্যতার প্রথম বিকাশের কারণ। এবং এই দুই কামণেই এদেশের দ্রুত অবনমন।

ভূমি উর্বরতা আর তাপাধিক্য হেতু প্রথমে হ্রাস পায় শ্রমের মূল্য। সেই সূত্রে প্রবল হয় শ্রেণি বৈষম্য। পরিণামে শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দেয় দারিদ্র্য, মুখর্তা এবং দাসত্ব। সময়ের সঙ্গে তা বর্ধিত হয় আর প্রাকৃতিক কারণে স্থায়িত্ব পায়। পরে সেই দুর্গতি সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে প্রাকৃতিক নিয়মেই যদি দেশের দুর্দশার উৎস;তবে বঙ্গদেশের কৃষকদের পক্ষে কথা বলার মূল্য আছে কি? বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই ফল চিরন্তন নয়। অবস্থা হেতু 'তা স্থায়ী হয়েছে এই মাত্র। অন্য নিয়মের দ্বারা তা দূর করা মায়। যে সব উপায়ে প্রাকৃতিক নিয়মজাত এই দুর্দশা রোধ করা সম্ভব—সমাজ বা রাজার আছে সে উপায়গুলি কার্যকর করার শক্তি। তার প্রমাণ ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপে গ্রিক সাহিত্য – সংস্কৃতির পুনরনশীলন দ্বারা উদ্ভত নব জাগরণ - মা তার বর্তমান উন্নতির উৎস।

প্রবন্ধের শেষ পরিচ্ছেদের নাম ‘আইন’। বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়টিকে ক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত করেছেন। বাংলার প্রজাবগের দুর্দশার অন্যতম কারণ জমিদারের নিপীড়ন - যার জন্ম প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে। শাসকের কাজ শক্তিমানের পীড়ন থেকে দূর্বলকে রক্ষা করা।

বাংলার বর্তমান শাসক ইংরেজ সরকারের কর্তব্য বলহীন প্রজাগণকে জমিদার-পীড়ন থেকে কম। করা। কিন্তু সে কাজে তারা সফল হয়নি।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র নিদার সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও শক্তিবুদ্ধি সম্পর্কে মুক্তিসহ আলোচনা করেছেন।

হিন্দু রাজত্বকালে জমিদার ছিল না। প্রজাগণ বা চাবিরা ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ (ষষ্ঠাংশ) ভিন্ন আর কোনো কর রাজাকে দিত না। তার প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্য বা সতিশে একাল কোনো করে উল্লেখ নেই। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স এ কিন্তু প্রথমাবধি চলত প্রজাপীড়ন। ফ্রান্স - এ শাসকগণের প্রজাপীড়নের ফল ফরাসি বিপ্লব।

বাংলার চাষি তথা প্রজাদের দুর্দশার সুচনা হয় মুসলমান শাসনকালে। রাজ্য শাসনে অপটু মুসলমান শাসকগণ প্রজাদের কাছ থেকে সোজাসুজি কর আদায় করতে পারেননি। তারা প্রতি পরগনায় নিযুক্ত করেন কর সংগ্রাহক। এদের বলা যায় কর সংগ্রহের চুক্তিকারক। কারণ নির্দিষ্ট কর শাসকদের প্রদানের শর্তে তারা নিযুক্ত হতেন। তার অতিরিক্ত কর আদায় করলে তাদের লাভ। সুতরাং তারা কৃষকদের তথ্য প্রজাদের কাছ থেকে সর্বাধিক কর আদায়ে মন দিলেন। বঙ্গ দেশের কৃষকের সর্বনাশের সূচনা হয় এভাবে।

মুসলমানদের পরে বাংলা তথা ভারতের শাসনক্ষমতা দখল করে ইংরেজ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রজাদের অবস্থার উন্নতির ইচ্ছা ইংরেজদের ছিল। কিন্তু ভ্রমৰশত লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তন করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কাওয়ালিস ভেবেছিলেন জমিদারিতে স্থায়ী স্বত্ব না থাকায় জমিদারগণ প্রজাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করেন। স্বত্ব স্থায়ী হলে তারা হবেন প্রজাপালক। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা তিনি চুক্তিবদ্ধ কর - সংগ্রাহকদের করলেন ভূস্বামী। দেখা গেল এর ফলে ভূমির যথার্থ অধিকারী কৃষকগণ চিরকালের জন্য ভূমির অধিকার হারাল; কিন্তু জমিদারদের প্রজানির্যাতক স্বভাবের পরিবর্তন হল না।

কৃষকদের রক্ষার্থে আইন করার আশ্বাস দিয়েছিলেন ওয়ালিস। ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৮ ধারা তার প্রমাণ। কিন্তু তা বিধিবদ্ধ হল না। ১৮১৯ সালে দেশের তৎকালীন শাসক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টরস এবং ১৮৩২ সালে বিচক্ষণ কিছু কর্মচারী প্রজাদের দুর্গতিনাশক বিধি প্রণীত না হওয়ায় আক্ষেপ করেছেন মাত্র, কাজ কিছু হয়নি, বরং চালু হয়েছে প্রজার অহিতকর আইন। ১৮১২ সালের ৫ আইনে কৃষক বা প্রজার কাছ থেকে যে কোনো হারে খাজনা আদায়ের অধিকার জমিদারদের দেওয়া হয়েছে। ফলে কৃষককে কর্ষণযোগ্য ভূমি প্রদান জমিদারের ইচ্ছা-সাপেক্ষ হয়েছে; Revenue Letter to Bengal 9th May 1821, Para ৫৪ - তে এরকমই বলা হয়েছে।

১৮১২ সালের ৫ আইন পূর্বের 'পঞ্চম' এর নামান্তর। এই আইনানুসারে জমিদার বাকি খাজনার নালিশ করে আইনসম্মতভাবে প্রজার সর্বস্ব লুঠ করে তাকে উত্যাত করতে সমর্থ হয়। অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ই ১৭৯০ সালে ১৮ আইনের ২ ধারায় জমিদারদের এ অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। অর্থাৎ ভূমির স্বত্বের সঙ্গে জমিদারগণ পেয়েছিলেন ফসল লুঠের আইনসংগত অধিকার।

ইংরেজ শাসনে প্রজাগণ তথা কৃষকগণ প্রথমত ভূমির অধিকার হারাল। দ্বিতীয়ত তাদের রক্ষার্থে আইনের আশ্বাস দেওয়া হলেও তা কার্যকর হল না। তৃতীয়ত ভূস্বামী পেলেন কৃষকদের উৎখাতের অধিকার। চতুর্থত কৃষকদের ফসল বাজেয়াপ্ত করার রীতি আইনসংগত হল। পঞ্চমত ১৮১২ সালের ১৮ আইনে বলা হল জমিদার ইচ্ছা করলে। নিরিখের বিবাদচ্ছলে কদিমী প্রজাদেরও ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন (নিরিখ - বলে বকেয়া খাজনার সুদকে 'কদিমী' মানে কায়েমি স্বত্ব - যে কৃষকের ভূমিতে স্থায়ী অধিকার আছে)।

প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থে জমিদারগণের খাজনা বৃদ্ধির অধিকার প্রথম ঈষৎ সংকুচিত হয় লর্ড ক্যানিং-এর প্রসিদ্ধ দশ আইনে। ১৮৬৯ - এর ৮ আইন দশ আইনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। দশ আইনে প্রজারা লুপ্ত অধিকার ফিরে পায়নি 'কোরোক' লুট ও অন্যান্য

অত্যাচার নিবারিত হয়নি। বাংলার প্রায় সব প্রজারই এ আইনে খাজনা বেড়েছিল। তথাপি। এ আইন পাস কালে ভূস্বামীরা প্রচণ্ড আপত্তি করেছিলেন।

অর্থাৎ ইংরেজশাসন কালে ভূমি সম্পর্কিত প্রতি আইনে প্রজাদের দুর্দশা বেড়েছে আর লাভবান ও ক্ষমতাশালী হয়েছে জমিদারপক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে অপরিচয় হেতু ইংরেজগণ সম্ভবত প্রজা - হিতকর কোনো আইন বিধিবদ্ধ করতে পারেননি। কিন্তু এ জন্য দেশশাসক হিসেবে প্রজা-নির্যাতনে তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। এরপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্ন শক্তিমান ইংরেজ যে কোনো অত্যাচারের প্রতিবিধানে সক্ষম; তার উদাহরণ ইংরেজ- পীড়নের কারণে। আবিসিনিয়া-নৃপতির রাজ্যচ্যুতি; অথচ ইংরেজ - রাজপ্রতিনিধির প্রায় সমক্ষে জমিদারদের কৃত প্রজাপীড়নের কোনো প্রতিকার হয় না কেন?আইন-আদালত যদি সর্বদা শক্তিমানের পক্ষে যায় তবে তা মূল্যহীন। এক্ষেত্রেও শাসক ইংরেজপক্ষ নীরব থাকেন কেন?

ইংরেজ প্রবর্তিত আইন কেন প্রজা তথা কৃষকের মঙ্গল সাধনে অসমর্থতা ক্রমানুসারে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

১) মোকদ্দমার ব্যয়বাহুল্য হেতু দরিদ্র কৃষক আদালতের সাহায্য গ্রহণে অক্ষম। জমিদারগণ অবলে বলী; তাই তারা আদালতের সাহায্যে কৃষক - নিপীড়নে সক্ষম।

২) দূরত্ব হেতু আদালতের সাহায্য গ্রহণে প্রায়শ অসমর্থ হয় কৃষকগণ। কারণ কাজের ক্ষতি এবং অনুপস্থিতির কারণে ফসল ও ভূমি জমিদার কর্তৃক দখলের সম্ভাবনা।

বিচারালয়ের অবস্থান দূরে হওয়ায় জমিদারের গোমস্তা প্রজাদের পারস্পরিক বিবাদের বিচার করে। পরিণামে তাদের দুর্গতি বৃদ্ধিই পায়। কারণ অপরাধী পক্ষের উপর ধার্য জরিমানা বা অন্যান্য শাস্তির ফল ভোগে করে গোমস্তা।

৩) আদালতে মামলা নিষ্পত্তির পদ্ধতিগত জটিলতা হেতু ফল লাভে বিলম্বের কারণে প্রতিকার হয়ে যায় অর্থহীন। বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃতভাবে তা আলোচনা করেছেন। কুড়ি টাকা মূল্যের ফসল দখলের ক্ষতিপূরণের নালিশ করে ডিক্রি হয় এক বছর পরে। জমিদারপক্ষের আপিলে যায় আরও এক বছর। শেষ পর্যন্ত ডিক্রিতে প্রথম রায়

টিকলেও ডিক্রি জারি হতে লাগে আরও এক বছর। এবং শেষ পর্যন্ত কুড়ি টাকার ফসলের ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাওয়া যায় পাঁচ টাকা। এইসব কারণে জমিদারের বিপক্ষে কোনো কৃষক সহজে নালিশ করতে চায় না।

আদালত ও বিচারকের সংখ্যাল্পতা আর প্রচলিত জটিল আইন এই অতি বিলম্বের কারণ। ইংরেজ-প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থার মূল ত্রুটি অবিচার হচ্ছে জেনেও আইনকে অত্যধিক মর্যাদা দান। বস্তুত এ বিচার পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের বিন্দু মাত্র উপকার হয়নি; কেবল উকিল, হাকিম, আমলা প্রভৃতি নতুন পদের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র।

জুরির বিচার ব্যাপারটিও যথাযথ বিচারের পদ্ধতি নয়। সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে নির্বাচিত জুরিবৃন্দ জটিল আইন সম্পর্কে অবহিত নয়। এজন্য তারা লজ্জিত হয় না। ফলে বিচারে প্রায়ই দোষী জমিদার-কর্মচারী পায় মুক্তি; নির্দোষ অভিযোক্তা প্রজারই হয় সর্বনাশ। তার পক্ষে সাক্ষ্যদানকারীগণও নানাভাবে নির্যাতিত হয়।

চতুর্থ কারণ অকারণে জটিল ও যুক্তিহীন আইন প্রণয়ন। অবিচারের পঞ্চম কারণ উচ্চপদস্থ ইংরেজ বিচারকগণের এদেশবাসী ও দেশীয় ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। এখানে একটি প্রশ্ন সহজেই মনে আসে যে অধিকাংশ বিচারকই যেখানে দেশীয় সেখানে সীমিত সংখ্যক উচ্চ পর্যায়ের ইংরেজ বিচারক কেমন করে অবিচার করতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে উন্নতি ও পদবৃদ্ধির অভাব থাকায় দেশীয় সুযোগ্য ব্যক্তিগণ বিচারকের পদ অপেক্ষা স্বাধীন ওকালতিকে গ্রহণীয় মনে করেন। তাই সাধারণত মধ্যম ও অধম ব্যক্তিগণই বিচারকের পদে আসীন হয়।

তা ছাড়া নিম্ন আদালতের রায় আপিলের ফলে উচ্চ আদালতের ইংরেজ বিচারপতির বিচারে দেশে, কারণে অনেক সুবিচারকও আপিলে টিকবে—এমন বিচার করেন। উচ্চ আদালত নিম্নস্থ বিচারকদের বিচারপদ্ধতি ও আইনের ভ্রমপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু অধীনস্থ জজ, মুনসেফ ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-দের তা মেনে নিতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তিতে আধুনিক বাংলার সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তাই ভ্রমপূর্ণ হলেও এ বন্দোবস্তের বিলোপ অসম্ভব। কারণ তাহলে দেখা

দেবে সমাজ বিপ্লব। তা ছাড়া ইংরেজগণ যে ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী বলেছেন তা বাতিল করলে তারা মিথ্যাবাদী এবং প্রজাগণের অবিশ্বাসভাজন হবেন। ইংরেজ শাসকপক্ষ কদাচ তা করবেন না। এক্ষেত্রে কৃষক প্রজা ও মালিক জমিদার – উভয় পক্ষের ক্ষতি না হওয়ার দিকে দৃষ্টি রেখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষতিকর দিকগুলি দূর করার চেষ্টা করা উচিত।

ইংরেজশাসক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমির স্বত্ব ও কর আদায়ের অধিকার দেশের মানুষকে দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কাজটি শাসকদের সুবিবেচনা ও ন্যায়ানুবর্তিতার পরিচায়ক। তবে এই বন্দোবস্ত প্রজার সঙ্গে হলে (অর্থাৎ ভূমির স্বত্ব দান সংক্রান্ত ব্যবস্থা) হত যথার্থ সবিবেচনার কাজ।

সমকালের সংবাদপত্র 'সমাজদর্পণ' - এ বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধটির কিছু সমালোচনা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করে তার যথার্থতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উক্ত সমালোচনায় বলা হয়েছে ইংরেজ রাজপুরুষ ও বণিককুল ভারতের অর্থসম্পদ স্বদেশে নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে দেশের দারিদ্র্য বাড়ছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বহু প্রচলিত এ তথ্য পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ

(১) বাংলা দেশ যে পূর্বে ঐশ্বর্যশালী দেশ ছিল তার প্রমাণ নেই। কিন্তু আগের চেয়ে দেশের ধন যে বেড়েছে বঙ্কিমচন্দ্র তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(২) বিদেশি বণিক সম্প্রদায় ভারতে এসে বাণিজ্য দ্বারা অথ উপার্জন করছেন। আপাতভাবে মনে হয় মে এক ফলে এদেশের সম্পদ চলে যাচ্ছে বিদেশে। কিন্তু বণিকগণ যেমন এদেশে বিদেশি পণ্য বিক্রয় করেন তেমনই দেশজ দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করেন। কিছু লাভ ভিন্ন তারা অন্য অর্থ পান না। বিদেশে দেশের পণ্য বিক্রয় করে তার যে লাভ, তা দেশের অর্থ নয়। বরং বিদেশি বণিকের নিকট দেশীয় দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রয় করে দেশের মানুষ অর্থ উপার্জন করে। এভাবে বৃদ্ধি পায় দেশের ঐশ্বর্য।

অন্য দেশের দ্রব্য দেশে বিক্রয় করে বণিকগণের যে মুনাফা-তার উৎস দেশের সম্পদ। মনে হয় যে এর ফলে দেশের সম্পদ হাসি পায়। কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। নাম প্রচলিত এ ধারণার বাশেই দেশাগত দ্রব্যের উপর কর স্থাপন করা হত । এই ব্যবস্থা 'প্রোটেকশন' (Protection) নামে পরিচিত ছিল। এই ভ্রান্ত ব্যবস্থা দূর করে মুক্ত বাণিজ্য নীতি চালু করেন অর্থনীতিবিদ লাইট (John Bright : ১৮১১ = ১৮৮৯) ও কবডেন (Richard Cobden : ১৮০৪ - ১৮৬৫)। ফ্রান্স- এ এই নীতি চালু করেন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন (Charles Louis Nepoleon Bonaparte : ১৮৩৮ - ১৮৭৩)। প্রোটেকশন নীতির ক্ষতিকারক দিকটি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেছিলেন বকল Backle George E= : ১৮৫৪ - ১৯৩৫) ও মিল। (john Stwart Mill : ১৮০৬-১৮৭৩)

বঙ্কিমচন্দ্র একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। দু টাকা দিয়ে বাঙালি বিদেশি থান কেনে। দমি বলি প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বেশি হয় তবে তা এদেশের ক্ষতির কারণ। যদিছ টাকার কম দামে ওই থান কোথাও পাওয়া যায়না তবে ওই দামই উচিত মূল্য। এতে দেশের আর্থিক অবস্থার কোনো হানি হয় না। বিরোধী দলের মত ওই টাকা দেশি তাতির কাছে থান কিনলে দেশের সম্পদ দেশেই থাকত। দেশি তাতি থান বোনে না। সে ওই সময় অন্য কাপড় বোনে এবং তা বিক্রয় হয়। অতএব তাতি অর্থাৎ বস্ত্র-উৎপাদক এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

আপত্তিকারকদের অন্য মত এই যে তাঁতি থানের পরিবর্তে ধূতি বোনে। ধুতির চেয়ে সস্তা হওয়ায় লোকে থান কেনে। ফলে তাতির ব্যবসায় কমে যায়। বঙ্কিমের মত এই যে সে ক্ষেত্রে তাতির উচিত অন্য ব্যবসায় গ্রহণ। সমাজতান্ত্রিকগণ প্রমাণ করেছেন সব ব্যবসায়ে সমান লাভ। অতএব তাতি অনায়াসে কৃষক হতে পারে। এর জবাবে বলা হয় সে রূপ স্থলে কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু অধিক শস্য উৎপন্ন হবে। সে জন্য ফসলের দাম কমে যাবে। সুতরাং দেশের ঐশ্বর্য হ্রাস পাবে।

বঙ্কিমচন্দ্র এর উত্তরে বলেন বাণিজ্যের অর্থ পণ্য বিনিময়। ইংল্যান্ড-এর কিছু দ্রব্য ভারত কেনে; ভারতের কিছু জিনিস ইংল্যান্ড ক্রয় করে। অর্থাৎ দেশের টাকা বিদেশে

যায় এবং বিদেশের টাকা দেশে আসে। আবার দেশজ কিছু দ্রব্যের উৎপাদন অল্প হলেও অন্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে। সুতরাং সূক্ষ্ম বিচারে দেশের সম্পদ কমে না।

নগদ টাকা বিদেশে গেলে দেশের ধন ক্ষয় হয় না। কারণ

(১) নগদ টাকা নয়, সম্পত্তিই ধন। নগদ অর্থের বিনিময়ে সম্পত্তি ক্রীত হলে ধন কমে না।

(২) বাণিজ্য চলে প্রধানত দুন্ডি বা অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি পত্রের মাধ্যমে; নগদ টাকায় নয়।

(৩) কিছু নগদ টাকা বা কালো বাণিজ্য সূত্রে বিদেশে যায়। কিন্তু বিদেশি বণিকগণ যে পরিমাণ রুপো এ দেশে আনেন তা থেকে আবার নগদ টাকা তৈরি হয়। এভাবে দেশের ধন দেশেই থেকে যায়। অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় বিদেশি বণিকদের আমদানি-রপ্তানি মূলক ব্যবসায়ের ফলে দেশের ধনবুদ্ধি হয়। দেশে যন্ত্রসভ্যতার ক্রমপ্রসার দেশের ধনবৃদ্ধির প্রমাণ—সূক্ষ্ম বিচারে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন এই উদাহরণ। তার মতে বিস্তীর্ণ রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে বিদেশের ধন আসছে এদেশে, পরিণামে দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিই পেয়েছে।

রাজকর্মচারীদের বেতন হিসেবে কিছু অর্থ বিদেশে যায়; কিন্তু তার পরিমাণ স্বল। অন্য দিকে বাণিজ্য ও কৃষির মাধ্যমে উৎপন্ন সম্পদ দেশে থাকছে এবং ক্রমশ বাড়ছে তার পরিমাণ।

অনেকে বলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ সম্পন্ন হওয়ায় দেশের ধনবৃদ্ধি ঘটছে। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যদি প্রজাদের সঙ্গে হত তবে ভূমিজ সম্পদ কয়েক জন জমিদারের নিকট জমা পড়ত না। কিছু অতি ধনী জমিদারের পরিবর্তে অধিকাংশ সাধারণ মানুষের জীবন হত সহজ সচ্ছল। ধনের সঞ্চয় অপেক্ষা তার বণ্টনই দেশের উন্নতির সহায়ক। সমাজতত্ত্ববিদদের মতে ধনের সাধারণত্ব ন্যায়সংগত এবং সমাজের উন্নতির লক্ষণ । সম্পদের সাধারণত্বের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। অল্প কিছু জমিদার অতন্ত্য সম্পন্ন এমন হয়ে বিলাস

হেতু অধোগমনের পথে চলেছেন। আর অধিকাংশ সাধারণ মানুষ অন্নবস্ত্রের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

যদি দেশের সকল ব্যক্তির অবস্থা সচ্ছল হত তবে দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হত। এভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ দেশের কৃষক প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং তার ফলে জাত জমিদারশ্রেণি এ দেশের সামগ্রিক উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

৫.২ লক্ষ্য

১. মিল-রুশোর সাম্যতত্ত্ব বঙ্কিমের চিন্তারাজ্যকে ভয়ানকভাবে নাড়া দিয়েছিল। সামাজিক কল্যাণ বা হিতবাদে বিশ্বাসী বঙ্কিম সাম্যনীতির মধ্যে তার বৃহত্তর সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। ওই মনোদীক্ষার একটা প্রায়োগিক কাঠামো রচনা ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। এজন্যই বাংলাদেশের রায়তি সমস্যার দিক নিরূপণের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধের অবতারণা।

২. উনিশ শতকের মধ্য পর্বে বাঙালি চিন্তাবিদরা বাংলার কৃষক সমাজের দূরবস্থার কারণ সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে একটা চিন্তা পরম্পরার যোগসূত্র রচনাও ছিল এই প্রবন্ধ রচনার লক্ষ্য।

৩. উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বিদেশি শাসকের প্রজাস্বত্ব আইন রচনায় আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার্থে কৃষকরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে স্থানভিত্তিক আন্দোলনে নেমেছিলেন। ওয়াহবী আন্দোলন, উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাস বিদ্রোহ, পাবনার কৃষক আন্দোলন, তিতুমীরের লড়াই, নীল আন্দোলন এই সময়কার অগ্রবর্তী কৃষক আন্দোলনের কিছু নমুনা। স্বভাবতই এ জাতীয় আন্দোলনে তাদের পাশে দাঁড়ানোর প্রশ্নটি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে জরুরি হয়ে উঠেছিল। নানা কারণে এ বিষয়ে প্রতিবাদী ভূমিকা পালনের সীমাবদ্ধতা থাকায় চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবীমহল সমবেদনামূলক প্রগতিবাদী সমর্থন জানাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

এই উদ্দেশ্যেই অন্যান্য সতীর্থদের সঙ্গে বঙ্কিমের এই প্রবন্ধ রচনা।

৫.৩ বিষয়বস্তু

'বঙ্গদেশের কৃষক চার পরিচ্ছেদ সমন্বিত প্রবন্ধ। পরিচ্ছেদ শিরোনামগুলি যথাক্রমে এইরকম ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি, জমিদার, প্রাকৃতিক নিয়ম এবং আইন। বাংলাদেশের কৃষকদের দূরবস্থার কারণ নির্ণয়ই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' পরিচ্ছেদটি দু-দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. ইংরাজ শাসনে নানাদিক থেকে সমাজের বাহ্যিক উন্নতির চিত্র বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মত-সমর্থনের পরিচয় আছে এই অংশে। বিষয়টি বিতর্কিত। ইংরাজি সভ্যতা-শাসনের সংস্পর্শে আমাদের সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে বুদ্ধিজীবীরা দ্বিধা বিভক্ত। কেউ সপ্রশংস, কেউ বা সমালোচনায় অতীব মুখর। বঙ্কিম নিরপেক্ষতাসহ একটা স্বীকারোক্তিতে দাঁড়াতে চেয়েছেন।

২. দেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রকৃত তাৎপর্য নিষ্কাশনের জন্য বঙ্কিম রুশোর সাম্যনীতির দ্বারা পরিচালিত এবং অবশেষে উন্নয়ন ধারা সম্পর্কে প্রতিবাদী। এই অংশটির প্রতিবেদনের সঙ্গে কমলাকান্তের দপ্তরের 'আমার মন' প্রবন্ধের বক্তব্যের যথেষ্ট মিল রয়েছে। ইংরেজ প্রবর্তিত মেটিরিয়াল প্রপারিটিতে আমাদের সমাজের যে আখেরে কোনো লাভ হচ্ছে না, একথাটা বেশ জোরের সঙ্গেই ওখানে উচ্চারণ করা হয়েছে।

ইংরেজ শাসনকালে অনেকগুলি ক্ষেত্রেই আমাদের জীবনযাপন সহজ, স্বচ্ছন্দ ও সুগম হয়েছে। যেমন, রেলওয়ে প্রবর্তন এবং রাস্তাঘাটের উন্নতির ফলে সংযোগ পদ্ধতি সহজতর হয়েছে। বেতার তরঙ্গ ও দূরভাষের ফলে দূরবর্তী নিকটজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে, চিকিৎসাশাস্ত্রে আধুনিক পদ্ধতি আসায় ব্যাধি ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব হয়েছে, আবাসন-প্রযুক্তির দৌলতে নিত্য জীবনযাপন হয়েছে স্বচ্ছন্দ ও আরামপ্রদ। এই সব গুণগত পরিবর্তনে সমাজের যে সার্বিক মঙ্গল সাধিত

হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু বঙ্কিম এক মুল প্রশ্নের মুখোমুখি করে দিয়েছেন আমাদেরকে কাহার এত মজাল ? এই উন্নয়নের ফলভোগীদের দুজতে গিয়ে বঙ্কিমের মনে হয়েছে, এই উন্নতির ধারা। কেন্দ্রবিশেষেই সীমাবদ্ধ, সমাজের আপামর জনসাধারণ তার ফলভোক্তা নয়। সাম্যতত্ত্বাদর্শে সদ্য মন্ত্রদীক্ষিত বঙ্কিমের জিজ্ঞাসা ।

- দেশের মঙ্গল?দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল ?তোমার আমার মাল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ?তুমি আমি দেশের কয়জন?আর এই কৃষিজীবী কয়জন?তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে?হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী?তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে?কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে?কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গাল নাই, সেখানে দেশের কোনো মঙ্গল নাই।

উনিশ শতকের উত্তরভাগে সভ্যতার প্রসাদবঞ্চিত নিরন্ন জনসাধারণের ওপর এই অসঙ্কোচ গুরুত্ব আরোপের ঘটনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা (তুমি-আমি) সমাজের তেমন কাজেই আসে না, অথচ উৎপাদক বৃহত্তর কুষিজীবীরাই শ্রম দিয়ে প্রকৃত সমাজসেবায় লিপ্ত, এই তুলনায় ব্যঞ্জনা বকিমের কালে সুদূর প্রসারী। বঙ্কিম উন্নতি ধারণার বিরোধী নন, কিন্তু ওই উন্নতির ফল বণ্টন যে একদেশদর্শী একথা প্রমাণ করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করেছেন। আমরা এই প্রবন্ধে একটি উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কী প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার দোষ। এই প্রবন্ধ-পরিকল্পনা থেকেই জানা গেল বতর্মান প্রবন্ধটি ত্রিস্তরিক।

বৃটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধির ফলে কৃষিকার্যের বিস্তার ঘটেছে। প্রজাবৃদ্ধি হওয়ার ফলে প্রচুর অনাবাদি জমি কৃষিজমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর চাষের বৃদ্ধি, দ্বিতীয় ধাপে বাণিজ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। রপ্তানি বাণিজ্যের উপকরণ হিসাবে চাল, রেশন, কার্পাস, পাট, নীল ইত্যাদি বিদেশে চালান যাচ্ছে। কৃষিগত আয়বৃদ্ধির আর এক সূচক হল দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি।

- আবার পূর্বেই সপ্রমাণ করা গিয়েছে, কর্ষিত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে। তবে দুই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রথম কর্ষিত ভূমির আধিক্যে, দ্বিতীয়ত ফসলের মূল্যবৃদ্ধিতে।

বঙ্কিমের স্পষ্ট অভিমত, 'এ ধন কৃষিজাত কৃষকেরই প্রাপ্য,' কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা এর অধিকারী নয়। এই কৃষিজাত ধনের সিংহভাগ চলে যাচ্ছে জমিদার-মহাজন বণিকের হাতে। কৃষকের অধিকার সংরক্ষিত করতে পারতো প্রচলিত আইন। 'আইন'—সে একটা তামাসা মাত্রবড়ো মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে। আইনবৃত্তির সঙ্গে জড়িত এক নিয়ামক ব্যক্তির পক্ষেও আইন-ব্যবসায়ের প্রতি এই অনাস্থা প্রকাশ বৃটিশ রাজত্বকালে যথেষ্ট দুঃসাহসিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ অন্তে কৃষকের ভাগের অংশকে বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন,

- আমরা এমত বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দুবিসর্গ পাইয়া থাকে। যাহা পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। অদ্যাপি ভূমির উৎপন্নে তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষক সম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাথার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।

সর্বাপহারক দুষ্ট জমিদার যেমন কৃষকের প্রাপ্য ভাগের গ্রাসকারী, আইন তেমনি কৃষকের অধিকার ভোগের পথে অনতিল বাধা। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে আমাদের বিশদভাবে অবগত করিয়েছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমের প্রস্তাবনা সবচেয়ে উপভোগ্য। কারণ এখানকার বিষয়ে বৈপরীত্য যথেষ্ট। জমিদারের কৃষকস্বার্থ বিরোধী অপদৃষ্টতাই তাঁর প্রদর্শিতব্য, অথচ একাজ সাফল্যের সঙ্গে করার ফাকে ফাকে বঙ্কিম একাধিকবার জানিয়ে দিয়েছেন তিনি জমিদার বিরোধী নন। একদিকে শুরু করেছেন এই সূত্র দিয়ে 'বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী', আবার পরক্ষণেই বলেছেন, "আমরা জমিদারের দ্বেষক নহি।" এমন বৈপরীত্যের স্পষ্ট কারণ বর্তমান। জমিদার বান্ধববেষ্টিত বঙ্কিমচন্দ্র জানেন, তিনি যা বলতে চাইছেন তার জন্য

তিনি অবশ্যই অনেকের নিকট তিরস্কৃত, ভংসিত, উপহসিত অমর্যাদাপ্রাপ্ত এবং বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন হবেন। অতএব তার মূল মেরে রাখার জন্য তার লক্ষ্য পরিষ্কার ঘোষণা করে বলেছেন,

- আমাদের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা জমিদার সম্প্রদায় সম্বন্ধ বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমিদার মাত্রেই দুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি অত্যন্ত মিথ্যাবাদী। অনেক জমিদার সদাশয়, প্রজাবৎসল এবং সত্য নিষ্ঠ। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে প্রকাশিত কথাগুলি বর্তে না। কতকগুলি জমিদার অত্যাচারী ; তাহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

মজা এই, কিছু জমিদার সদাশয় হলেও বঙ্গদেশের কৃষকের কথাগুলি জমিদার সম্প্রদায় সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কারণ কৃষক বনা ও অত্যাচারের ব্যবস্থাকে এদেশে নায়েব-গোমস্তারাই টিকিয়ে রেখেছেন, এ ঘটনা জমিদারের অজান্তে সংঘটিত একদা কখনই প্রমাণিত হয়নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেরে প্রতিপাদ্য হল, কৃষকের আয়ের বৃহদং। জমিদারের খাই পূরণেই অপব্যয়িত হয়। জমির খাজনা বাদে জমিদার নানা অছিলায় কৃষকের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য বলে যা আদায় করেন তা এক বিশাল প্রতারণাই। বঙ্কিমচন্দ্র এরকম ১৮টি দফা বা item পরিবেশন করেছেন। এ থেকে জমিদারের ছলনাপূর্ণ অর্থহরণের। একটা ছবি ফুটে ওঠে। বঙ্কিম পরিবেশিত দফাগুলি হল

১. নায়েবের পুণ্যাহের নজর

২. জমিদারগিদের পাঁচ শরিকের নজর

৩. গোমস্তাদিগের নজর।

৪. পুণ্যাহের পিয়াদার তলবানা ।

৫. গোপাল নগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ

৬. আষাঢ় কিস্তির পিয়াদার তলবানা

৭. ভাদ্রের কিস্তির পিয়াদার তুলনা

৮. নৌকাভাড়া

৯. সদর আমলার পূজার পার্বণী

১০. কাছারীর জমিদার

১১. ওই হালশাহানা

১২. পাঁচ শরিকের পার্বণী

১৩. শ্রীরাম সেন, হেড মুহুরি

১৪. জমিদারের পুরোহিতের ভিক্ষা

১৫. গোমস্তাদের ভিক্ষা।

১৬. মুহুরিদের ভিক্ষা

১৭. বরকন্দাজদের দোলের পার্বণী।

১৮. ডাকটেক্স

বঙ্কিমচন্দ্র হিসেব করে দেখিয়েছেন, কৃষকদের খাজনা ছাড়া সম্বৎসরে সেকালের হিসাবে প্রায় ৫৫ টাকা জমিদারের জন্য আদায় দিতে হয়। চিত্রটাও মজার। জমিদারি । জমিদারের, কিন্তু তার নিত্য রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মেটাচ্ছে প্রজারা। জমিদার, তার শরিকবৃন্দ, নায়েব, গোমস্তা, মুহুরি, বরকন্দাজ, পুরোহিত সবার জন্য মাথাপিছু আদা, বৎসর ব্যাপা উৎসবের পার্বণ, তাও প্রজাদের দিতে হবে। আবার ওইসব ফিকিরের আদায়ের নির্লজ্জ মনোহারি নামকরণ ভিক্ষা। জমিদার কৃষককে তলব করবেন, তারও মুখরচ জোগাবে কৃষক তলবানা নামে। আশ্চর্যের বিষয়, এসব কিছুতে ধনবান জমিদারের। মানহানিও হয় না।

এই সব অর্থ সংহরণের দুটি দিক দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

মন্তব্য

১. জমিদারের কৃপণতা ও গাফিলতির জন্যই এসব অর্থ নায়েব-গোমস্তারা উদরস্থ করে। কারণ তাদের মাইনে যথেষ্ট নয়। কোনো কোনো জায়গায় বেতন খানসামার বেতনের চেয়ে কম। তাই প্রজাপীড়ন করে তাদের অভাব মেটাতে হয়।

২. অনেক ক্ষেত্রে জমিদার দুই ভূমিকা গ্রহণ করে কৃষকদের দ্বিগুণ উপদ্রবের কারণ হয়।

- জমিদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশেষে কর্জ দিয়া, তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন।

এদের ক্ষেত্রে জমিদার ও মহাজন একই ব্যক্তি। Indian observer পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বঙ্কিম এইভাবে বাংলার কৃষকের দুরবস্থার ছবি এঁকেছেন এবং স্বীকার করেছেন এ ধরনের অকথ্য প্রজাপীড়ন তাহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমিদারদিগেরই হাত। আর আছে British Indian Association, কু-চরিত্র জমিদারদের শাসিত করার দায় তিনি ওই সংস্থার ওপর ন্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে জমিদারদের আত্মচরিত্র শুদ্ধি এবং সংস্থার দায় গ্রহণ ছাড়া দেশের মঙ্গলের আর কোনো উপায় নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিম প্রাকৃতিক নিয়মের কথা তুলেছেন। পরিচ্ছেদটি যেন কিছু বিক্ষিপ্ত ধরনের। কারণ অন্য দুই পরিচ্ছেদের আলোচনা তথ্যভিত্তিক, কেবল তৃতীয় পরিচ্ছেদে তত্ত্বভিত্তির দিকটি আলোচিত হয়েছে। এমনটা হওয়ার কারণ আছে। 'সাম্য' পুস্তিকা লুপ্তির পর 'বঙ্গদেশের কৃষক' পুনর্মুদ্রণের সময় বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য পুস্তিকার একাংশ এই প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই ৩য় পরিচ্ছেদটি সাম্য গ্রন্থের ৪র্থ পরিচ্ছেদের সম্পূর্ণ অনুরূপ। সুতরাং এই প্রবন্ধের ৩য় পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু জানার জন্য সাম্য-পুস্তিকার ৪র্থ পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদের বিবেচ্য বিষয় আইন। দেশে বলবৎ আইনও কৃষকস্বার্থ বিরোধী। জমিদারদের আর্থিক নিপীড়ন এবং দৈহিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনের শরণ নিতে গিয়ে কৃষক কীভাবে আরও প্রকট দুর্গতির কবলিত হয় তার

ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, এই অংশে।কৃষকদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য বিদেশী শাসকেরা বারবার প্রয়াস করেছেন। তাঁদের ইচ্ছা পবিত্র হলেও ভ্রান্তি ও অনভিজ্ঞতাবশে ওইসব আইন থেকে কোনো প্রজাকল্যাণ প্রসূত হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে এই বিভ্রমের সূত্রপাত। কর্ণওয়ালিশ ভেবেছিলেন জমিদারিত্বের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারলেই জমিদার মারফৎ প্রজাকল্যাণ হওয়া সম্ভব। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃজন করিলেন। রাজস্বের কন্ট্রাকটরদিশকে ভূস্বামী করিলেন। কিন্তু এর দরুণ প্রজাস্বত্বের পথ যে চিরতরে বন্ধ হল তা উপলব্ধি করার অবকাশ তার রইল না।

- প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী ; জমিদারেরা কস্মিন্ কালে কেহ নহেন— কেবল সরকারি তহশীলদার। কর্ণওয়ালিশ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোনো লাভ হইল না।

প্রজাদের কপাল ভাঙার এই শুরু। এরপর ১৮১২ সালের পাচ আইনে, ওই সালেরই ১৮ আইনে, ১৮৫৯ সালের দশ আইনেও প্রজাদের দুর্গতি প্রতিবিধানের কোনো প্রকৃত সুরাহা হল না।

প্রচলিত আইন থেকে কৃষকের সাহায্য পাওয়ার পথও কতগুলি সুনির্দিষ্ট কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিম সুন্দরভাবে তারও প্রস্তাবনা করেছেন।

প্রধানত, মোকদ্দমা ব্যয়সাধ্য হওয়ায় ধনী জমিদার ইচ্ছামত তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন, নিঃস্ব কৃষক ওই পথে পদার্পণ করে কার্যত সর্বান্ত হন।

দ্বিতীয়ত, আদালতগুলি দূরে অবস্থিত। পদব্রজে ওই দূরত্ব অতিক্রম করতে গেলে কৃষকের যে সময় লাগে তাতে দীর্ঘদিন তাকে কৃষিক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। এতে দু-দুরনের ক্ষতি হয়।

ক. কৃষিকার্যের দেখাশোনায় ছেদ ঘটায় চাষ নানাভাবে মার খায়।

খ. তার অনুপস্থিতির সুযোগে দুষ্ট গোমস্তারা তার ধান কেটে নেওয়া বা জমি দখলের ব্যবস্থা করে ফেলে।

তৃতীয়ত, দেওয়ানি মামলার ফয়সালা হতে প্রচুর বিলম্ব হয়। এই বিলম্ব কৃষকের ক্ষতি সর্বাধিক। এতে কৃষকদের প্রচুর শ্রমদিবস নষ্ট হয়। আবার বিলম্বিত মামলার জন্য নিয়মিত আদালত ফি ও বকশিস দিতে গিয়ে কৃষক কার্যত সর্বস্বান্ত হয়।

চতুর্থত, আইনের অভ্যন্তরীণ জটিলতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হওয়ায় কৃষকের দুর্দশা বাড়ে।

পঞ্চমত, বিচারকরা অত্যন্ত অযোগ্য। তাঁবেদার মানুষের গুণগত যোগ্যতার পরিচয় না নিয়েই বৃটিশ শাসকেরা তাদের যথেচ্ছভাবে বিচারক নিয়োগ করে, এরা আইন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নয়। উপরন্তু ধনবান জমিদারদের সঙ্গে এদের স্বার্থযুক্ত মিত্রতা থাকে। ফলে এই ধরনের বিচারকের কাছে যথার্থ বিচার পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান প্রবন্ধটির চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষাংশে এক বিতর্কের অবতারণা করেছে। সমাজদর্পণ নামে এক পত্রিকায় এই ধারাবাহিক রচনার এক প্রতিবাদী লেখা প্রকাশিত হয়। ওই প্রবন্ধের উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি শেষ করেন।

প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিম প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। জমিদার জমির উৎপন্ন ভোগ করে বলেই তাদের ঘরে ধনসঞ্চয় কেন্দ্রীভূত। প্রজাওয়ারি ব্যবস্থা হলে ওই ধন সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারতো। সমাজতত্ত্ববিদেরাও ধনের সাধারণতার মধ্যে সমাজোন্নতির লক্ষণ সন্ধান করেন। দু-চারজন ধনবান বা অতিধনবান ব্যক্তির বদলে ছয় কোটি সুখী প্রজাকে দেখার সদিচ্ছা পোষণ করেই বলি এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি শেষ করেছেন। প্রবন্ধের অন্তিম বার্তাটি এই রকম

- যাহারা বিবেচনা করেন যে, জমিদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী তাঁহাদের তদ্রুপ বিশ্বাসের কোনো কারণ নাই।

৫.৩ প্রতিপাদন

'বঙ্গদেশের কৃষক' এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিকে বাংলার কৃষক জীবনের দর্পণ বলা যায়। ব্যবহারিক জীবনে এ দেশের কৃষকরা যে দুর্দশার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে তার কার্যকারণ সন্ধানই এ রচনার লক্ষ্য। সযত্ন অভিনিবেশ, বিশ্লেষণ ও তথ্যানুসন্ধান এর প্রধান সম্পদ। তবু এ প্রবন্ধ প্রতিপাদ্যতায় তেমন দৃঢ় নয়। ভাব পরম্পরায় কোনো সত্য বা তত্তে পৌছানোয় বদ্ধ প্রতিজ্ঞা এ প্রবন্ধকে ভিতর থেকে তাড়া দেয়নি। দিলে এমন, মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের পর একটা সমাধান সূত্রের হদিস পাঠক অবশ্যই পেয়ে যেতেন। কৃষকদের নাজেহাল অবস্থার প্রতীকী দৃষ্টান্ত ধরে কার্যকারণে পৌছে দায়মুক্ত অংশগুলিকে আরো সুচিহ্নিত করে আরো স্পষ্টবাদিতায় তার নিরাকৃতির দাওয়াই বাতলানো যেতো। কিন্তু বঙ্কিমের রচনায় কোনো সমাধান পরিকল্পনা নেই। ব্যাখ্যায় পরিষ্কার, জমিদার-মহাজনদের নগ্ন শোষণের শিকার কৃষক সম্প্রদায় এবং এক ধারাবাহিকতার ইতিহাস তাকে অভিশপ্ত ব্যবস্থার চেহারা দিয়েছে। সঙ্গে রয়েছে এই ব্যবস্থার পরিপোষক কৃষকস্বার্থবিরোধী দণ্ডবিধি। অথচ রচনাটির অভ্যন্তরে এ ব্যবস্থা উচ্ছেদের কোনো ডাক নেই, নেই সার্বিক সংস্কারের জন্য কোনো সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক পরামর্শ। শুধুই জমিদারদের আত্মচেতনার ওপর ভরসা অথবা বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের শুভবুদ্ধির কাছে সকাতর অনুনয়ে এ দায়িত্ব সেরে ফেলেছেন বকিম । দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের দুর্গতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অভিযোগের কাঠগড়াতেও দাঁড় করানো হয়নি। ফলে এরকম এক প্রতিবাদী ঐতিহাসিক রচনায় কোনো বিরূপতা বা ঘৃণা উৎসারণেরও ব্যবস্থা নেই। রুশোর সাম্যবাদীতত্ত্বের প্রবল প্রেরণাকে ধারণ করেও বঙ্কিমের এ জাতীয় লক্ষ্যহীনতা সত্যই বিস্ময়কর। এতো লক্ষ্যপ্রযুক্ত বিশ্লেষণী আয়োজনের পর প্রবন্ধটি যখন পরিণামে। জানান দেয়, জমিদারি ব্যবস্থার প্রয়োজন বা অপরিহার্যতা সম্বন্ধে লোক বিশ্বাস কাটানোর তাঁর মূল লক্ষ্য ছিলো, তখন পর্বতের মুষিক প্রসবে আমরা হতাশ হই। সম্ভবত জমিদারবন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার আশঙ্কাতেই বঙ্কিম দৃঢ় প্রতিপাদনে

ইতস্তত করেছেন। প্রতিপাদন দৃঢ়তর হলে কৃষকবন্ধু বঙ্কিম ইতিহাসে আরো উন্নততর মর্যাদার অধিকারী হতেন।

৫.৪ সমালোচনার দৃষ্টিকোণ

'বঙ্গদেশের কৃষক' বঙ্কিমের সমালোচনার দিক থেকে সবচেয়ে 'হেভিওয়েট' প্রবন্ধ । যুক্তিবাদী, হিতবাদ এবং সাম্যবাদী বিষয়ে তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞানের এক প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত এ প্রবন্ধটি। বলা যায়, চিন্তাবিদ বঙ্কিমের এক মহা পরীক্ষাস্থল । নবজ্ঞানের আলো দিয়ে সমাজ জীবনের অন্দকার মোচনের এই প্রয়াস অবশ্যই এক ঐতিহাসিক কাজ। বিশেষ করে নাগরিক সাহিত্যের বর্ণ-বৈচিত্র্যে মন্ত্রমুগ্ধ পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে এক অভিজ্ঞান প্রাপ্তির সুযোগ।

প্রথমত, এ প্রবন্ধ অবহেলিত কৃষকসম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের অভিমুখী করে দেয়। পরে এদের জীবনের অতলস্পর্শী অন্ধকার সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করে তোলে। সভ্যতাগর্বি পাঠক পরম বিস্ময়ে আবিষ্কার করতে পারেন আলোকদায়ী সভ্যতার আলো ওপরে আলো ছড়ালেও তার নীচের ঘন মসীকৃষ্ণ অন্ধকারকে দূর করতে সম্পূর্ণ অপারগ। যারা আমাদেরই ভোগ্য অন্নের উৎপাদক তাদের কায়ক্লেশের জীবন আমাদের মর্ম বেদনার কারণ হয়ে দাড়ায়। বঙ্কিম যে সমকালে আলোড়িত সমাজ-ইস্যুর বদলে দেশের প্রধান ধারাবাহিক অর্থনীতির কূটরহস্য ভেদে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন তার জন্য তাঁকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাই। পত্রিকা সম্পাদক রূপে জাতীয় সমস্যার অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অভিনিবিষ্ট থাকার জন্য তিনি অধিক সংখ্যায় আমাদের সমাজ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ উপহার দিতে পারেননি, এ আক্ষেপ ওই এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধেই তিনি মিটিয়ে দিতে পেরেছেন।

বাংলা প্রবন্ধের যাত্রালগ্নেই বাংলা গদ্যে সমাজ অর্থনীতি বিষয়ক পর্যালোচনার দ্বারপথ, উন্মোচন করে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই এক ঐতিহাসিক কাজ করেছেন। মিল বেন্থামের শিক্ষা যে তার বিফলে যায়নি তা এ প্রবন্ধের সমাজকল্যাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসংশয়ে প্রমাণ

করে দেয়। ‘দেশের শ্রীবৃদ্ধি’ অংশে দেশের প্রকৃত হিতের ব্যাখ্যা বঙ্কিমের মগজ নয় অন্তর থেকেই নিঃসৃত। এ প্রসঙ্গে একথাও বলা যায়, বঙ্কিমী মন্তব্য প্রমাণ করে য়ুরোপীয় সভ্যতার বাহ্য সম্পদ গর্বের অন্তরশায়ী দুর্বলতাকে বাঙালি চিন্তাবিদরা ধরে ফেলেছেন। রেনেসাঁস প্রসাদ লোলুপ বাঙালির মনে মোহমুক্তির পালা শুরু হয়েছে, দাপুটে সভ্যতার হিতসাধনী প্রকৃতিকে বিনা বিচারে আর বিশ্বাস করতে আমরা প্রস্তুত নই, বাদেশের কৃষক তা প্রমাণ করে ছাড়ে। রুশোর সাম্যনীতি প্রসঙ্গে প্রবন্ধের অভিপ্রায় আর এক দিক থেকে আমাদের চোখ খুলে দেয়। ‘সাম্য’ বিলুপ্ত সূত্রেই বঙ্কিম বলেছিলেন ওই মন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপনা তাঁর জীবনে এক ভ্রান্তি-বিভ্রমের ঘটনা। কিন্তু ওই মন্তব্য যে বাহ্যিক, বঙ্কিমের অন্তরমুলে সাম্যনীতির প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব যে আদৌ দূরীভূত হয়নি, এ প্রবন্ধ সেই সত্যকে স্পষ্ট করে দেয়। দেশের শ্রীবৃদ্ধির সমস্ত concept টাই তো সাম্যনীতির কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র আমার মন, বিড়াল জাতীয় প্রবন্ধের উপস্থাপনাও যে ওই মহাজ্ঞানের হাত। ধরে তাতে সন্দেহ কী!

‘বঙ্গাদেশের কৃষক এই সব ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বেশ লক্ষণীয় ভাবেই স্ববিরোধ দুষ্ট। বঙ্গদেশের কৃষক বেশ ব্যাপক ভাবেই জমিদারি ব্যবস্থার নাগপাশকে ব্যাখ্যা সহ পরিষ্কার করছে পাঠকবর্গের কাছে। জমিদার এবং মহাজন এই দুই ভূমিকায় তার অত্যাচার ও প্রতারণতার ছবি পাঠকের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার। অথচ জমিদার। তন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর বিরূপ প্রবন্ধে আদৌ প্রকট নয়, দৃঢ়চেতা ও প্রত্যয়ী বঙ্কিম যেভাবে এ প্রবন্ধে তার আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তুর (জমিদারবর্গ) প্রতি নরম মনোভাব প্রকাশ করেছেন এবং বারবার হাত কচলেছেন তা বিস্ময়কর। প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য থেকেই বেশ পরিষ্কার, তাঁর নিরপেক্ষতা বিষয়ে জমিদারবন্ধুদের সন্দেহ-বিরোধ নিয়ে তিনি সবিশেষ ভাবিত। এ জন্যই তাঁকে ঘোষণা করে জানাতে হয়েছে, জমিদারতন্ত্রের তিনি বিরোধী নন, সদাশয় জমিদাররা তাঁর লক্ষ্যবস্তুর বাইরে, কেবল দুষ্ট অত্যাচারী জমিদারদের লক্ষ্য করেই তার এই প্রবন্ধ রচনা। অথচ প্রবন্ধের সূত্রপাতেই তিনি। বলেছিলেন, বাংলাদেশের জমিদাররাই কৃষকের শত্রু। তাহলে জমিদারতন্ত্রই বা কী করে রেহাই পায়, আর সদাশয় জমিদারদের কাছেই বা কীসের জন্য হাতজোড় করতে হয় !

জমিদার সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়নে এই দ্বিধা বা সংশয়াচ্ছন্নতা এই প্রবন্ধের অর্ধেক দীপ্তি হরণ করে নিয়েছে। কেবল এ জন্যই শেষ অবধি কোনো দৃঢ় প্রতিপাদনে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৫.৫ অনুশীলনী

১।বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকদের দুরবস্থার কি কি কারণ উপস্থাপিত করেছেন? কারণসমূহ পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করো।

২। বঙ্গদেশের কৃষক এবং জনসাধারণ কৃষকদের দুর্গতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কোন ব্যবস্থা বিশেষ কে দায়ী করেছেন প্রবন্ধ অনুসারে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো ।

৩।বঙ্গদেশের কৃষক অনুসরণে প্রচলিত বিচারব্যবস্থার বিশ্লেষণ করো।

৪। বঙ্গদেশের কৃষক বঙ্কিমচন্দ্র দেশের তৎকালীন উন্নতি কোণ চিত্র এঁকেছেন? কেন এই উন্নতিকে তিনি দেশের প্রকৃত উন্নতি বলতে চাননি?

৫। বঙ্গদেশের কৃষক বাংলা তথা ভারতের উন্নতি অবনতির কারণ হিসেবে ভূ প্রকৃতি এবং আবহকে দায়ী করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, প্রবন্ধ অনুসরণে বিশ্লেষণ করো।

৬। বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দবস্ত সম্পর্কে কি বলেছেন?

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত- বঙ্কিমচন্দ্র ১৯২০

অজরচন্দ্র সরকার -বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য -বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

অলোক রায় -প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ মন

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়- সমালোচনা রূপরেখা,বঙ্কিম পর্ব

প্রমথনাথ বিশী- সাহিত্যচিন্তা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একক ৬ - দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা

বিন্যাসক্রম

৬.১ জীবনী

৬.২ সাহিত্য প্রতিভা

৬.৩ লক্ষ্য

৬.৪ বিষয়বস্তু

৬.৫ কবিত্ব

৬.৬ প্রতিপাদন

৬.৭ সমালোচনার দৃষ্টিকোণ

৬.৮ অনুশীলনী

৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ১৮৭৩ সালে পরলোকগমন করার পর বঙ্কিমচন্দ্র তার জীবনী ও গ্রন্থাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। সদ্যপ্রয়াত কোন ব্যক্তির জীবনচরিত রচনা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কারণ প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু দোষ থাকে। সুতরাং দীনবন্ধুর জীবনচরিত আলোচনা করতে গেলে সেই দোষেরও বর্ণনা দিতে হয়। বঙ্কিম তা করতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন

এই বঙ্গদেশে সবাই দীনবন্ধুকে চিনত। তিনি কী প্রকারের লোক ছিলেন তাও সবাই জানত। সুতরাং তাঁর জীবনচরিত তিনি লিখতে চান না। তবে এই প্রবন্ধে তিনি অঙ্গীকার করেছেন, যা লিখবেন তা পক্ষপাতশূন্য হয়েই লিখবেন। দীনবন্ধু স্নেহঋণে তিনি ছিলেন ঋণী। তবু মিথ্যা প্রশংসার দ্বারা সেই ঋণ পরিশাোধ করবার চেষ্টা তিনি করেননি।

৬.১ জীবনী

১২৩৮ সালে কাঁচরাপাড়া রেল স্টেশনের কয়েক ক্রোশ দূরে নদিয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম। যমুনা নদী এই গ্রামটিতে চারদিক থেকে বেষ্টন করেছে বলে এই গ্রামের নাম চৌবেড়িয়া। দীনবন্ধুর পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। দীনবন্ধু বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি অল্প বয়সে কলকাতায় এসে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। সেই সময়ে তিনি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে পরিচিত হন। সংবাদ প্রভাকর' তখন সর্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র। বাংলা সাহিত্যের ওপরেও ছিল ঈশ্বরগুপ্তের অপ্রতিহত প্রাধান্য। তিনি সবসময় তরুণ লেখকদের নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। আধুনিক লেখকদের মধ্যে অনেকে ছিলেন তাঁর শিষ্য। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই তাঁর কাছে ঋণী। তবে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা জানিয়েও বঙ্কিম বলেছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের রুচি বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না। ফলে অনেকেই তার প্রদত্ত শিক্ষা থেকে অন্য পথে গমন করেছেন। কেবল দীনবন্ধুর মধ্যেই কিছু পরিমাণে তাঁর শিক্ষার চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। যেমন নিম্নের কবিতাটি ঈশ্বরচন্দ্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়—

“এলোচুলে বেণে বউ আলতা দিয়ে পায়,

নলক নাকে, কলসী কাকে, জল আনতে যায়।”

মন্তব্য

বাংলা সাহিত্যে চারজন হাস্যরসিক ব্যঙ্গপ্রিয় লেখকের নাম করা যেতে পারে। তারা হলেন টেকচাঁদ (প্যারীচাঁদ মিত্র), হুতোম (কালীপ্রসন্ন সিংহ) ঈশ্বরগুপ্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র। সহজেই বোঝা যায়, হুতোম হলেন টেকচাদের শিষ্য এবং দীনবন্ধু হলেন ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য। তবে টেকচাদের সঙ্গে হুতোমের বিশেষ মিল থাকলেও ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে দীনবন্ধুর কিছুটা অমিল আছে। ঈশ্বরগুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ প্রধান দীনবন্ধু লেখায় হাস্যরস প্রধান। হাস্যরসের দিক দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের থেকে দীনবন্ধুর কৃতিত্ব অধিক।

বঙ্কিমের ধারণা দীনবন্ধুর প্রথম রচনা 'মানব চরিত্র নামক একটি কবিতা—যেটি ঈশ্বরগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'সাধুরগুন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সে লেখা বলে ঐ কবিতায় অনুপ্রাসের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের মতে ঐটি ঈশ্বরচন্দ্রের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। কবিতাটি বঙ্কিমকে এত মুগ্ধ করেছিল যে কবিতাটি তিনি আদ্যপ্রান্ত মুখস্থ করেছিলেন এবং প্রায় সাতাশ বছর পরেও ঐ কবিতার কিছু অংশ তার মনে ছিল। যেহেতু কবিতাটি আর কখনো পুনর্মুদ্রিত হয়নি সেজন্য সেই কবিতা পাঠকের আর চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। সেই কারণে নিজের স্মৃতির উপর নির্ভর করে কয়েকটি ছত্র এখানে তুলে ধরেছেন যাতে পাঠক দীনবন্ধুর প্রথম লেখার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। কবিতাটির প্রথম দুটি চরণ এরূপঃ

মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া।

দুখানলে দহে দহে বিরহে হিয়া ।।

তিনি আরও দুটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন -

(১) যে দোষে সরস হয় সে জন সরস।

যে দোষে বিরস হয় সে জন বিরস।।

(২) "যে নয়নে রেণু অণু অসি অনুমান।

বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ণ চক্ষু-বাণ ।

দীনবন্ধু মাঝে মাঝে সংবাদ প্রভাকরে কবিতা লিখতেন। তাঁর কবিতাপাঠক সমাজে আদৃত হয়েছিল। তিনি পরপর দুবছর জামাইষষ্ঠীর সময়ে ‘জামাইষষ্ঠী’ নামক দু'টি কবিতা লেখেন। সে দুটি পাঠকের প্রশংসা অর্জন করে। কিন্তু তিনি ‘সুরধনী’ এবং দ্বাদশ কবিতা নামে যে দুটি কাব্য লিখেছিলেন সে দুটি পাঠকের কাছে আদরণীয় হয়নি। তার মূল কারণ, ‘জামাইষষ্ঠী’ হাস্যরস প্রধান কিন্তু সুরধনী ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের লেশমাত্র নেই। দীনবন্ধু 'সংবাদ প্রভাকর'-এ ‘বিজয় কামিনী' নামে একটি কাব্য লিখেছিলেন। এটি একটি আখ্যায়িকা কাব্য—এই কাব্যের নায়কের নাম বিজয় এবং নায়িকার নাম কামিনী। এই কাব্যের দশ বার বছর পরে দীনবন্দু ‘নবীন তপস্বিনী’ নামক নাটক লেখেন। এই নাটকেরও নায়কের নাম বিজয় এবং নায়িকার নাম কামিনী। চরিত্রের দিক দিয়ে উপাখ্যানের দিক দিয়ে কাব্য ও নাটকের মধ্যে বিশেষ কিছু প্রভেদ নেই। দীনবন্ধু হেয়ার স্কুলের পাঠ সম্পন্ন করে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানেও তিনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি বৃত্তিও পেয়েছিলেন।

১৮৫৫ সালে দীনবন্ধু কলেজ পরিত্যাগ করে ১৫০ টাকা বেতনে পাটনার পোষ্ট মাস্টারের পদ গ্রহণ করেন। ঐ কাজে তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন এবং দেড় বছর পরেই তার। পদোন্নতি হয়। তিনি উড়িষ্যার বিভাগের ইন্সপেকিটং পোষ্ট মাস্টার পদে নিযুক্ত হন।কিন্তু পদোন্নতি হ*লেও* তার বেতন বৃদ্ধি হয়নি। বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল অনেক পরে। কিন্তু এই পদ গ্রহণ দীনবন্ধুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। কারণ পোষ্ট অফিসের কাজে তাঁকে সারাবছর নানাস্থানে ভ্রমণ। করতে হত। কোন স্থানে এক দিন, কোন স্থানে দুদিন, কোন স্থানে তিন দিন থাকতে হত। স্ময়ীভাবে কোন এক জায়গায় দীর্ঘদিন থাকতে পারতেন না। বছরের পর বছর ক্রমাগত এক স্বনি থেকে অন্য স্থানে গমন করায় তার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এতে একদিকে যেমন ক্ষতি হয়েছে তেমনি অন্য এক দিক দিয়ে লাভও হয়েছে। পরিহাস নিপুণ লেখকদের একটি বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন। নানা চরিত্রের সংস্পর্শে এসে সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। দীনব দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে নানাবিধ চরিত্রের সন্ধান

পেয়েছিলেন। সেইসব জরিত্র তাঁর নাটকে স্থান পেয়েছে। তার নাটকে যে রকম বৈচিত্র্য আছে বাংলা সাহিত্যে তা বিরল।

উড়িষ্যা থেকে দীনবন্ধু নদিয়া বিভাগে আসেন এবং সেখান থেকে ঢাকা বিভাগে প্রেরিত হন। এই সময় নীলচাষ নিয়ে নিদারুণ গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানাস্থানে অভি। করে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেন। সেই অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে 'নীলদর্পণ' নাটক লিখে বঙ্গীয় প্রজাদের বিশেষ উপকার করেন।

দীনবন্ধু ছদ্মনামে নাটকটি লিখেছিলেন। তিনি জানতেন স্বনামে লিখলে তার প্রভূত ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। কারণ যে সকল ইংরেজদের অধীনে তিনি কাজ করতে তারা ছিলেন নীল সাহেবদের বন্ধু। তাছাড়া পোষ্ট অফিসের কাজে বহু নীলকর সাহেবদের সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়েছিল। তাঁরা শত্রুতা করলে তাঁর অনেক অনিষ্ট হতে পারে জেনেও নীলদর্পণ লিখতে তিনি পরান্মুখ হননি। অবশ্য দীনবন্ধু নাম গোপন করার চেষ্টা করলেও তাঁর সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কারণ বাংলাদেশের সকলেই কোন না কোন ভাবে জেনে গিয়েছিল যে, দিনবন্ধুই এর প্রণেতা।

নীলদর্পণ ইংরাজিতে অনুবাদিত হয় এবং ইংলন্ডে পৌছে যায়। নীলদর্পণ প্রকাশ করার জন্য লং সাহেবের অর্থদণ্ড এবং কারাদণ্ড হয়। সীটনকার সাহেবও অপদস্থ হন। মধুসূদন দত্ত এর অনুবাদ করেছিলেন বলে গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হয়েছিলেন। শোনা যায়, এর জন্য তিনি সুপ্রিমকোর্টের চাকরি পর্যন্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

লং সাহেব কারারুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই হাকে বা নীলদর্পণের কোন বিশেষ গুণ থাকার জন্যই হোক—গ্রন্থটি বহু ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত এবং পঠিত হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত নীলদর্পণ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের এই সৌভাগ্য হয়নি।

ঢাকা বিভাগ থেকে দীনবন্ধু পুনরায় নদীয়ায় ফিরে আসেন এবং 'নবীন তপস্বিনী' নামক নাটকটি লেখেন। এই সময়েই তিনি কুষ্মনগরে একটি বাড়ি কেনেন। ১৮৬৯ সালের শেষে অথবা ১৮৭০ সালের প্রথমে তিনি কৃত্মনগর ছেড়ে কলকাতায় আসেন এবং

সুপরনিউমররি ইনস্পেকটি পোষ্ট মাস্টার পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭১ সালে তিনি লুশাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করবার জন্য কাছাড় গমন করেন।

কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। দীনবন্ধুর কপালে এ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু জোটেনি। তার যে রকম কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ছিল তাতে তিনি যদি। বাঙালী না হতেন তাহলে তিনি পোষ্ট মাস্টার জেনারেল, এমনকি, ডাইরেক্টর জেনারেল হতে পারতেন। ডাকবিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে দীনবন্ধু ও সূর্যনারায়ণ সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ বলে গণ্য হয়েছিলেন।সূর্যনারায়ণ আসামের গুরুতর কার্যের ভার গ্রহণ করে সেখানে অবস্থান করেছিলেন। কোন কঠিন সমস্যা উপস্থিত হলে মাঝে মাঝে দীনবন্ধুকে সেখানে পাঠানো হত। এইভাবে তাণে ঢাকা, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম দার্জিলিং, কাছাড় এবং বিহারের অনেক স্থলে যেতে হত।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে দীনবন্ধু কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। রোগাক্রান্ত হয়ে অতি সাবধানে থাকতেন। তিনি অল্প পরিমাণে আফিং সেবন করতে আরম্ভ করেছিলেন। এ তার রোগের কিছুটা উপশম হয়েছিল। কিন্তু ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে তিনি যোড়ায় আজ হয়ে শয্যাগত হন। শেষ পর্যন্ত এই রোগেই তার মৃত্যু হয়।

“নবীন তপস্বিনীর” পর “বিয়ে পাগলা বুড়ো” লিখিত হয়।এই গ্রন্থ কোন এক জীবিত লক্ষ্য করে লিখতে হয়েছিল। শুধু এই গ্রন্থ নয়। দীনবন্ধুর অনেক গ্রই বাস্তব ঘটনা ও বাস্তব চরিত্রকে অবলম্বন করে রচিত। যেমন নীলদর্পণের অনেক ঘটনাই সত্য, নবীন তপস্বিনীর বড়রানী, ছোটরানী চরিত্র, সধবার একাদশীর প্রায় সকল চরিত্রই, ‘জামাই বারিকের’ দুই স্ত্রীর চরিত্র কোন না কোন বাস্তব চরিত্রকে অবলম্বন করে লেখা। এই ভাবে কখনো প্রকৃত ঘটনা জীবিত চরিত্র কখনো বা প্রাচীন উপন্যাস, ইংরাজি গ্রন্থ, অথবা প্রচলিত খোসগল্প থেকে উপাদান সংগ্রহ করে দীনবন্ধু তাঁর নাটকগুলিকে সকলের সামনে উপস্থিত করতেন। যেমন ‘নবীন তপস্বিনী নাটকে হোঁদলকুকুঁতের ব্যাপারটি গ্রহণ করেছেন প্রাচীন গল্পকথা থেকে এবং জলধর ও জগদম্বার। চরিত্র দুটিকে গ্রহণ করেছেন “Merry Wives of Windsor' থেকে।

দীনবন্ধু ‘লীলাবতী' নাটকটি লিখেছিলেন যত্ন সহকারে। অন্যান্য নাটকের তুলনায় এর দোষ অতি অল্প । এই সময়টিকে দীনবন্ধুর কাব্যপ্রতিভার মধ্যাহ্নকাল বলা যেতে পারে। এরপর থেকেই তাঁর প্রতিভা অস্তমিত হতে থাকে। সাহিত্যের ইতিহাসে এরকম উদাহরণ বহু পাওয়া যায়। বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন ইংরাজি সাহিত্যের স্যার ওয়াল্টার স্কটের কথা। স্কট প্রথমে তিনখানি উৎকৃষ্ট কাব্য লেখেন। কিন্তু 'Lady of the Lake' লেখার পর আর তাঁর কাব্য সুনাম অর্জন করতে পারল না। তখন তিনি কাব্য পরিত্যাগ করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন এবং তাঁর যাবতীয় খ্যাতি প্রথমে পনের-ষোলটি উপন্যাসের জন্য। Kenilworth-এর পর আর কোন উপন্যাস প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়নি। 'Ivanhoe'স্কটের সাহিত্য-প্রতিভার মধ্যাহ্ন লগ্নে লিখিত আর Kenilworth সহ অন্য দুটি উপন্যাস তার অস্তগামী পর্বে লেখা।

মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ‘কমলে কামিনী’ প্রকাশিত হয়েছিল। তার পূর্বে অবশ্য সুরধনী কাব্য ‘জামাই বারিক’ এবং ‘দ্বাদশ কবিতা’ প্রকাশিত হয়।

এরপর বঙ্কিম দীনবন্ধুর চরিত্রের অপূর্ব দিকটি তুলে ধরেছেন। দীনবন্ধু ছিলেন সরল, অকপট, স্নেহময় হৃদয়ের অধিকারী। অহঙ্কার, অভিমান, ক্রোধ, স্বার্থপরতা ও কপটতা থেকে তাঁর হৃদয় ছিল আশ্চর্যজনক ভাবে মুক্ত। দার্জিলিং থেকে বরিশাল, কাছাড় থেকে গঞ্জাম সর্বত্রই ছিল তার অগণিত বন্ধু। যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন। যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেন তিনিই তাঁর বন্ধু হয়ে যেতেন। দেশে তার মত সুরসিক লোক। অত্যন্ত বিরল। তার সরস সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মুগ্ধ হত। অত্যন্ত দুঃখী মানুষও তাঁর সৃষ্ট হাস্যরসের ধারায় ভেসে যেত। তার হাস্যরস সৃষ্টির যে পটুতা তার সামান্য অংশ তার গ্রন্থে। ফুটে উঠেছে যদিও সেগুলিই বঙ্গ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের গ্রন্থ। তাঁর হাস্যরসের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কথোপকথনের মধ্যে। এমনও দেখা গেছে আর হাসিতে পারি না’ বলে অনেকে তাঁর কাছে থেকে পালিয়ে গেছেন।

যারা নির্বোধ অথচ আত্মাভিমানী দীনবন্ধু সে সব লোককে নিয়ে কৌতুকে মেতে উঠতেন । তিনি যাদের আত্মাভিমানের প্রতিবাদ করতেন না, শুধু তাদের উস্কে দিতেন

আর তাদের রক্তাভজা দেখতেন। অবশ্য শেষ কয়েকটি বছরে তাঁর হাস্যরসের পটুতা মন্দীভূত হয়েছিল কিন্তু একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকা অবস্থাতেও এই ব্যঙ্গারস তিনি পরিত্যাগ করেননি। তার শরীরের নানা স্থানে ক্রমাগত ফোড়া হতে থাকে। শেষে সেই ফোড়া তাঁর পায়ে হয়। মৃত্য আর তখন সন্নিকটে। সেই সময়ে এক বন্ধু তাঁর কাছে এলে দীনবন্ধু ক্ষীণ হাসি হেসে বলেছিলেন "ফোড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে।" অর্থাৎ আবার তাঁকে ইহলোক ত্যাগ করতে হবে।

পরিশিষ্টাংশ মনুষ্যমাত্রেরই রাগ আছে কিন্তু দীনবন্ধুর রাগ বলে কোন বস্তু ছিল না। কেউ তাঁকে রাত পারতেন না। তবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র জামাই বারিকের ভোঁতারাম ভাটের মধ্যে কিছুটা রাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

অনেকে যেমন দীনবন্ধুর প্রশংসা করেছেন তেমনি তার কিছু নিন্দুকেও ছিল। বলি বলেছেন যেখানেই যশ সেখানেই নিন্দা। এটাই জগতের নিয়ম। পৃথিবীতে যারা যশস্বী হয়েছেন তাঁরাই কিছু লোকের দ্বারা নিন্দিত হয়েছেন। তিনি এর কতকগুলি কারণ নির্দেশ করেছেন।

প্রথমত, পৃথিবীতে দোষশূন্য মানুষ নেই। তিনি বহুগুণ বিশিষ্ট তার দোষগুলি বেশি চোখে পড়ে। লোকে সেগুলিই বেশি করে প্রচার করে।

দ্বিতীয়ত, গুণের সঙ্গে দোষের চিরবিরোধ।ফলে দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ গুণযুক্ত মানুষের শত্রু হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, কর্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হলে কাজের সূত্রে বহু শত্রু জন্মায়। শত্রুরা অন্য কোন উপায়ে শত্রুতা করতে না পারলে শুধু নিন্দার দ্বারা শত্রুতা করে।

চতুর্থত, একশ্রেণির মানুষ আছে যারা প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করতে ভালবাসে। আর যশস্বী-ব্যক্তির নিন্দা বা ও শ্রোতা—উভয়েরই কাছে অত্যন্ত সুখদায়ক।

পঞ্চমত, ঈর্ষা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম।

সুতরাং দীনবন্ধু নির্বিরোধ নিরহঙ্কার, এবং ক্রোধশূন্য হলেও তাঁর কিছু নিন্দুকও ছিল। প্রথম দিকে তার কোন নিন্দুক ছিল না, কিন্তু নবীন তপস্বিনী প্রকাশিত হবার পর যখন তাঁর যশের মাত্রা বেড়ে উঠল তখনই নিন্দুকেরা তাঁর নিন্দায় প্রবৃত্ত হল। দীনবন্ধুর গ্রন্থে অনেক দোষ আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দোষের থেকে গুণের ভাগ্যই যে বেশি সে কথা নিন্দুকেরা। মনে রাখেন না। অনেকে অবশ্য তাঁর কাছে চাকরির জন্য উমেদারী করে নিল হয়ে রাগে তাঁর। নিন্দা করতেন। এই শ্রেণির নিন্দুকদের নিন্দায় দীনবন্ধু হাসতেন।

দীনবন্ধু কখনও কোন অসৎ কার্য করেননি। বন্ধুদের অনুরোধে বা সংসর্গদোষে নিন্দনীয় কার্যের সংস্পর্শ তিনি সব সময়ে এড়াতে পারেননি ঠিক, কিন্তু যা অসৎ, যাতে পরের অনিষ্ট আছে, যা পাপ, দীনবন্ধু তা কোনদিন করেননি। তিনি ছিলেন পরোপকারী, তাঁর অনুগ্রাহে বহু লোকের অন্নের সংস্থান হয়েছিল।

আর একটি ব্যাপারে দীনবন্ধু দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। তার স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত পতিপরায়ণা। তিনি ছিলেন গৃহসুখে সুখি। একদিনের জন্যও তাঁদের দাম্পত্য কলহ হয়নি। কস্মিনকালে মুহূর্তের জন্যও তাঁদের কথা কাটাকাটি হয়নি। একবার কলহ করবার জন্য দীনবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হয়েছিল।

দীনবন্ধুর বিবাহ হয়েছিল হুগলির কিছু উত্তরে বংশবাটি গ্রামে। তিনি ছিলেন অটিসি সন্তানের জনক।

৬.২ সাহিত্য প্রতিভা

দীনবন্ধুর জীবন কাহিনি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করার পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য প্রাত মূল্যায়নে অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমেই তিনি বলেছেন ১৮৫৯/৬০ সাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহা. চিরস্মরণীয়—কারণ ঐ সময়টি নুতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধু ছিলেন ঈশ্বরগুপ্তের একজন কাব্য-শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের যারা কাব্য-শিষ্য তাদের দীনবন্ধু যতটা গুরুর কবি স্বভাবের অধিকারী হতে পেরেছিলেন আর কেউ তা পারেননি। শরাপ্ত যে ধরনের হাস্যরস সৃষ্টি করেছিলেন, দীনবন্ধু ছিলেন তাঁর সার্থক অনুসরণকারী। বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার যে-ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দীনবন্ধুর মধ্যেও তা লক্ষ্য করা যায়। আবার যে রুচিহীনতার জন্য দীনবন্ধুকে দোষ দেওয়া হয় সেই রুচিহীনতাও গরুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

তবে কাব্য প্রতিভার দিক দিয়ে দীনবন্ধুর স্বান ঈশ্বরগুপ্তের ওপরে। কাব্য রচনা করতে গেলে কবিকে যে গুণটি আয়ত্ত করতে হয় তা হল সৃষ্টি কৌশল। এই সৃষ্টি কৌশল ঈশ্বরগুপ্তের ছিল না। কিন্তু দীনবন্ধুর ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। তাঁর সৃষ্ট জলধর, জাদ, মল্লিকা, নিমচাদ তার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে যা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, করুণ ও প্রশান্ত—সেসবে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। সেজন্য বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন প্রভৃতি চরিত্রগুলি আমাদের মুগ্ধ করতে পারেনি। এই একই কারণে লীলাবতী, কামিনী-সৈরিন্দী, সরলা আমাদের কাছে আদরণীয় নয়। কিন্তু যা শূল অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তা ফুটিয়ে তুলতে পারতেন অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে।

দীনবন্ধুর শিল্প-সাফল্যের মূল কারণ দুটি—(১) সামাজিক অভিজ্ঞতা। (২) তীব্র সহানুভূতি। বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা দীনবন্ধুর ছিল। বঙ্কিম দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, এই অভিজ্ঞতা বাঙালী লেখকদের মধ্যে আর দেখা যায় না। অনেকেরই রচনা শক্তি আছে, লেখবার যোগ্য শিক্ষা আছে, অনেকেই দেশেই মঙ্গলার্থে লেখেন কিন্তু দেশের অবস্থা সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না। তাদের অভিজ্ঞতা শুধু কলকাতার স্বশ্রেণির লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেউ কেউ দু'চারটি গ্রাম বা ক্ষুদ্র নগর দেখেন নি তা নয়, কিন্তু তারা লোকের সঙ্গে মেশেননি, তারা শুধু পথ-ঘাট, বাগান, বাগিচা, হাট, বাজার দেখেছেন। দেশ সম্পর্কে তাদের যে জ্ঞান তা সংবাদপত্র পাঠ করে পাওয়া—যা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। লোকের সঙ্গে না মিশলে দেশ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা যায় না।

এ ব্যাপারে দীনবন্ধু ছিলেন এক ব্যতিক্রমী লেখক। সমাজ অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে বাঙালী লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ স্থানে। সরকারি কাজে তাকে মণিপুর থেকে গঞ্জাম, দার্জিলিং থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বার বার ভ্রমণ করতে হয়েছিল। শুধু পথভ্রমণ বা নগর নগর দর্শন নয়, ডাকঘর দেখার জন্য তাঁকে গ্রামে গ্রামে যেতে হত। লোকের সঙ্গে মেশবার তাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আনন্দের সঙ্গে সব শ্রেণির লোকের সঙ্গে মিশতেন। একদিকে ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য কন্যা আদুরীর মত গ্রাম্য বর্ষীয়সী নারী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নসীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, অন্যদিকে নিমচাদের মত শিক্ষিত শহুরে মীতাল, অটলের মত বাবু, কাঞ্চনের মত নগরবাসিনী, রাক্ষসী, নদের চাঁদ, হেমচাঁদের মত বখাটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডেপুটি, নীলকুঠির দেওয়ান, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা-সকল মানুষের নাড়ি নক্ষত্র জানতেন। তারা কি করে, কি বলে তা জানতেন এবং কলমের মুখে তা ফোটাতে পারতেন। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত মানুষকে সামনে রেখে চরিত্রগুলিকে আঁকতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর দেখলে তার লেজ শুদ্ধ আঁকতেন। এই রকমই ছিল তাঁর realism বা বাস্তবতাবোধ, তার ওপর idealize বা আদর্শায়িত করার। ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট।সমুখে জীবন্ত আদর্শ রেখে আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলে তার ঘাড়ের ওপর অন্যের দোষগুণ চাপিয়ে দিতেন। যেটি যেখানে সাজে, সেখানে সেটি বসাতেন। নিমচাঁদ, ঘটিরাম, ভোলাচাঁদ—প্রভৃতি চরিত্রের এই রূপে উৎপত্তি। এইসব সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা বিস্ময়কর।

তার এই সামাজিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে সুতীব্র সহানুভূতি। সকল শ্রেণির মানুষের প্রতিই ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি। গরিব-দুঃখীর দুঃখের মর্ম খুব ভালভাবে বুঝতেন বলেই তাঁর পক্ষে তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী বা রেবতীর মত চরিত্র অঙ্কন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার এই সুতীব্র সহানুভূতি শুধু গরিব-দুঃখীর জন্য ছিল না—ছিল সকলের জন্য। তাঁর নিজের চরিত্র ছিল পবিত্র, কিন্তু তিনি দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝতে পারতেন। বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণে ধর্মাত্মা পাপাত্মা—সকল শ্রেণির মানুষের সঙ্গেই মিশতেন। তিনি নিমচাদের ন্যায় নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝতে পারতেন,

বিবাহে ভগ্ন মনাোরথ রাজীবের দুঃখ বুঝতেন, গোপীনাথের মত নীলকর সাহেবের কর্মচারীর যন্ত্রণা বুঝতে পারতেন। বস্তুতঃ এমন পরদুঃকাতর মানুষ একান্ত বিরল।

বঙ্কিম বলেছেন যে, সকল কবিরই সহানুভূতি থাকা উচিত, সহানুভূতি ছাড়া কেউ উচ্চ শ্রেণির কবি হতে পারেন না। কিন্তু অন্য কবিদের সঙ্গে দীনবন্ধু একটু প্রভেদ আছে। সহানুভূতি প্রধানত কল্পনাশক্তির ফল। কবিরা একজনকে দেখে আপন কল্পনা শক্তির দ্বারা এমন চরিত্র সৃষ্টি করেন যে, সেই চরিত্রটির প্রতি তার সহানুভূতি জন্মে যায়। যদি তাই হয়, তাহলে এমনও হতে পারে যে, অতি নির্দয় নিষ্ঠুর ব্যক্তিও কল্পনা শক্তির বল থাকলে কাব্য প্রণয়ন কালে দুঃখীর সঙ্গে আপনার সহানুভূতি মিশ্রিত করে কাব্যের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। কিন্তু বিপরীতে এমন শ্রেণির লোকও আছেন দয়া করুণ প্রভৃতি কোমল বৃত্তি তাঁদের হৃদয়ে এত প্রবল যে সহানুভূতি তাদের সহজাত, তা কল্পনা শক্তির অপেক্ষা করে না। মূল কথা প্রথম শ্রেণির লোকের সহানুভূতি ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেণির লোকের সহানুভূতি তাদের ইচ্ছাধীন নহে, তারাই সহানুভূতির অধীন। এক শ্রেণির লোক যখন মনে করেন তখনই সহানুভূতি এসে উপস্থিত হয়। নইলে সে আসতে পারে। সহানুভূতি তাঁদের দাসী। অপর শ্রেণির লোকেরা নিজেরাই সহানুভূতির দাস, তাঁরা চান বা না চান সহানুভূতি তাদের হৃদয়ে আসন পেতে বিরাজ করছে। প্রথম শ্রেণির লোকের কল্পনা শক্তি প্রবল, দ্বিতীয় শ্রেণির লোকের প্রতি দয়া প্রভৃতি বৃত্তি প্রবল।

দীনবন্ধু দ্বিতীয় শ্রেণির লোক ছিল। সহানুভূতি তার অধীনে ছিল না। তিনি নিজেই ছিলেন সহানুভূতির অধীন। তাঁর সর্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁকে যখন যে পথে নিয়ে যেত তখন তিনি তাই করতে বাধ্য হতেন। তাঁর গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখা যায় তার কারণ আমরা বুঝতে পারি। তিন নিজে সুশিক্ষিত, নির্মল চরিত্র কিন্তু তাঁর গ্রন্থে যে রুচিহীনতা দেখা যায়, তার মূল কারণ তার বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ দুর্দমনীয় সহানুভূতি। যার প্রতি তার সহানুভূতি, যার চরিত্র তিনি আঁকতে বসেন তার সমুদয় অংশই তাঁর কলমে ফুটে উঠত। কিছু বাদ দেবার বা মার্জিত করার শক্তি তার ছিল না। কেননা তিনি ছিলেন সহানুভূতির অধীন, সহানুভূতি, তার অধীন ছিল না। তিনি বাস্তব চরিত্রকে

সামনে রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করতেন। ফলে সেই বাস্তব চরিত্রের কোন অংশ ত্যাগ করতে পারতেন না। তাোরাপের সৃষ্টি কালে তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে তা বাদ দিতে পারতেন না। আদুরীর সৃষ্টি কালে আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে তা বাদ দিতে পারতেন না। নিমচাঁদ গড়বার সময় যে ভাষায় সে মাতলামি করে তা ছাড়তে পারতেন না। তাই আমরা একটা গোটা তোরাপ, গোটা নিমচাঁদ, গোটা আদুরী দেখতে পাই। রুচির দিকে তাকাতে গেলে আমরা ছেড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাদ দেখতে পেতাম।

বঙ্কিম বলতে চেয়েছেন দীনবন্ধু রুচির দোষ তার ইচ্ছায় ঘটেনি, তাঁর তীব সহানুভূতির গুণেই ঘটেছে। মহৎ গুণও অনেক সময় দোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। আসলে বঙ্কিম বোঝাতে চেয়েছেন দীনবন্ধুর যে দুটি প্রধান (১) তার সামাজিক অভিজ্ঞতা (২) তাঁর প্রবল সর্বব্যাপী সহানুভূতি—যেখানে এ দুটির মধ্যে একটির অভাব হয়েছে সেখানেই তাঁর কবিত্ব নিষ্ফল হয়েছে। যারা তার কাব্যের নায়ক-নায়িকা তাদের চরিত্র যে ততটা সুন্দর হয়নি এটাই তার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চরিত্র, কিন্তু লীলাবতী, কামিনী, বিজয় বা ললিত মোহন তা নয়। সহানুভূতি আদুরী বা তোরাপের বেলায় তীব্র, তাদের ভাষা পর্যন্ত তিনি কলমের ডগায় এনেছেন, কিন্তু কামিনী ও বিজয়ের বেলায় চরিত্র ও ভাষা দুটোই বিকৃত হয়েছে। যদি দীনবন্ধুর সহানুভূতি স্বাভাবিক ও সর্বব্যাপী হয় তাহলে তা এখানে নিস্থল হল কেন ? বঙ্কিম বলেছেন এর কারণ অভিজ্ঞতার অভাব। লীলাবতী ও কামিনী শ্রেণির নায়িকা সম্বন্ধে তাঁর কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। অভিজ্ঞতা না থাকার মূল কারণ, লীলাবতী ও কামিনীর মত মেয়েরা বাঙ্গালী সমাজে কোনদিন ছিল না বা নেই। বাঙালীর মেয়ে প্রেম-সম্পর্কিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে, যে প্রেম নিবেদন করছে তার প্রতি প্রাণমন সমর্পণ করে বসে আছে—এমন মেয়ে বাঙালী সমাজে প্রায় নেই বললেই চলে। ইংরেজ সমাজে আছে, ইংরেজ মেয়েদের জীবনই তাই। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য *গ্রন্থে* অবশ্য এমন উদাহরণ আছে। দীনবন্ধু ইংরেজ ও সংস্কৃত নাটক উপন্যাস পড়ে। তার অনুকরণে এই সব নায়িকাদের ছবি আঁকতে গিয়েছিলেন। ফলে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। যা নেই, যার

আদর্শ সমাজে নেই তা আঁকতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন। তাঁর চরিত্র প্রণয়নের ধরনই ছিল, জীবন্ত আদর্শকে সম্মুখে রেখে চিত্রকরের ন্যায় ছবি আঁকা। এখানে জীবন্ত আদর্শ নেই সেজন্য সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও নেই। জীবন্ত আদর্শ ছাড়া সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি আসতে পারে না। জীবনহীনে সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্পর্ক নেই। যেখানে সামাজিক অভিজ্ঞতা নেই। সেখানে স্বাভাবিক সহানুভূতিও নেই। ফলে এক্ষেত্রে দীনবন্ধুর কবিত্ব নিল হয়েছে।

যেখানে *প্রেমের* ব্যাপার নেই এমন নায়িকাদের ক্ষেত্রে যেমন ঐশরিন্ধ্রি চরিত্র অঙ্কনে দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করে পুস্তকগত আদর্শকে অবলম্বন করেছেন। ফলে সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হয়নি।

দীনবন্ধুর নায়ক চরিত্রগুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। দীনবন্দুর নায়ক চরিত্র সর্বগুণসম্পন্ন বাঙালী যুবা কাজকর্ম নেই, কাজকর্মের মধ্যে কাহারও মানবহিতৈষিতা, কাহারও শুধু প্রেমে ক্ষণ হওয়া। এ ধরনের চরিত্র বাঙালী সমাজে নেই। কাজেই এখানে অভিজ্ঞতা নেই। সহানুভূতিও নেই। সুতরাং দীনবন্ধুর কবিত্বও এখানে ব্যর্থ হয়েছে, যে প্রণালী অবলম্বন করে দীনবন্দু জলধর, জগদম্বা বা নিমচাঁদের চরিত্র অঙ্কন করেছেন এক্ষেত্রেও যদি সেই প্রথা অবলম্বন করতেন তাহলে তাঁর কবিত্ব সফল হত। কিংবা যেখানে একটিমাত্র আধারে বাতি আদর্শ পাচ্ছেন না সেখানে বহু সংখ্যক জীবন্ত আদর্শের অংশ বিশেষকে বেছে নিয়ে সঠিক ভাবে সুসজ্জিত করতেন তাহলেও তাঁর কবিত্ব সফল হত তার সে শক্তিও ছিল। কিন্তু দীনবন্ধু তা না করে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে ভিন্ন পথে যাত্রা করেছিলেন। যে সমস্ত কবিদের সহানুভূতি স্বাভাবিক বা স্বতোৎসারিত নয় অর্থাৎ যাঁদের সহানুভূতি কল্পনার অধীন, তাঁরা কল্পনার বলে জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করে সহানুভূতিকে জোর করে এনে একটা নবীনমাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবন্ত করতে পারতেন। শেক্সপীয়র এইভাবে জীবন্ত Caliban বা জীবন্ত Ariel সৃষ্টি করেছেন। কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করেছেন। এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী। দীনবন্ধুর অলৌকিক সমাজে অভিজ্ঞতা ও তীব্র সহানুভূতির ফলেই, তাঁর প্রথম নাটক

নীলদর্পণের সৃষ্টি। যে সমস্ত জায়গায় নীলচাষ হত সেই সব জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। নীলকর সাহেবদের প্রজাপীড়ন স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ, নিজের দুঃখ বলে তার হৃদয়ে প্রতীয়মান হল। আর তখনই তিনি সেই দুঃখকে লেখনীমুখে প্রকাশ করলেন। বঙ্কিম নীলদর্পণ নাটকটিকে আমেরিকার বিখ্যাত উপন্যাস Uncle Tom's Cabin-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। Uncle Tom's Cabin যেমন আমেরিকা। থেকে ক্রীতদাস প্রথাকে চিরকালের জন্য উচ্ছেদ করেছে, তেমনি নীলদর্পণ' নাটকটি বাংলাদেশের প্রজাবৃন্দকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছে। অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় ছিল বলে নীলদর্পণ নাটকটি দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক থেকে শক্তিশালী নাটকে পরিণত হয়েছে। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকতে পারে কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি অন্য কোন নাটকে নেই। তার আর কোন নাটকই পাঠককে বা দর্শককে এতখানি বশীভূত করতে পারেনি। বাংলা ভাষায় এমন অনেক নাটক বা উপন্যাস রচিত হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি। সেই সৌন্দর্য সৃষ্টিকে অবহেলা করে সমাজসংস্কারকে মুখ্য উদ্দেশ্য করলে কবিত্ব নিল হয়। কিন্তু ‘নীলদর্পণ” উদ্দেশ্যমূলক হলেও কাব্যাংশেও তা উৎকৃষ্ট। এর মূল কারণ দীনবন্ধুর মোহময়ী সহানুভূতি সব কিছুকেই মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, তিনি যে দীনবন্ধু কবিত্বের দোষগুণের আলোচনা করেছেন, তা তিনি শুধু তাঁর গ্রন্থ পাঠ করে জেনেছেন তা নয়, তিনি তাঁকে ভলভাবে চিনতেন বা জানতেন বলেই করতে পেরেছেন। তিনি দীনবন্ধুর হৃদয়ে যা দেখেছেন গ্রন্থের মধ্যেও তা লক্ষ্য করেছেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, গ্রন্থাকারকে না জানলে তার গ্রন্থ এভাবে বুঝতে পারতেন না। তার যাই হোক, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল, দীনবন্ধুর অসাধারণত্ব কোথায় তা বোঝানো। এ ব্যাপারে তিনি যে সর্বাংশে সফল হয়েছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৬.৩ লক্ষ্য

১. নির্ভেজ্জাল জীবনচরিত লেখা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। তবে জীবনস্বভাব ও কর্ম জীবনের কোন্ কোন্ সূত্রগুলি দীনবন্ধুর সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত তা নির্বাচন। করে এনে ব্যাখ্যা করা এ রচনার লক্ষ্য।

২. প্রবন্ধ শিরোনামেই প্রকাশিত দীনবন্ধুর রচনাবলীর পরিচয় প্রদান ও তৎসহ তার প্রধান প্রবন্ধগুলির সমালোচনা করা এ রচনার দ্বিতীয় লক্ষ্য।

৩.গুরু-শিষ্যের (ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্র) সাহিত্যিক ধাতু প্রকৃতির প্রতি তুলনা রচনাটির আর এক লক্ষ্য।

৬.৪ বিষয়বস্তু

প্রবন্ধটি দুই অংশ—জীবনী ও কবিত্ব। কিন্তু কোনোটিরই আনুপূর্বিক প্রস্তাবনা এ রচনার উদ্দেশ্য নয়। বলা যায়, দুই অংশে প্রয়োজনীয় সাবান ব্যাখ্যার আয়োজন করে দীনবন্ধুর বোধযোগ্য পূর্ণ আলেখ্য রচনাই এখানকার মূল অভিপ্রায়।

জীবনী অংশের প্রস্তাবনার তাঁর করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে একটা পূর্বাভাস দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। দীনবন্ধু প্রয়াণের অল্প কিছুকাল পরেই এ প্রবন্ধ লিখিত। সুতরাং টাটকা স্মৃতি ভারাক্রান্ততার চাপ রয়েছে তার উপর। উদ্দিষ্ট জীবন চরিতে সাক্ষ্য ও সংশ্লিষ্টতার যেসব ব্যক্তি তখনও জীবিত থাকেন তাদের বিড়ম্বনা বড় ভারী হয়। গুণ বা নিন্দাবচনে তাঁদের পক্ষে স্বচ্ছন্দ হওয়া মুশকিল হয়। এ জন্যই বঙ্কিম সূত্রপাতেই জানিয়েছেন, ‘দীনবন্ধুর জীবনচরিত লিখিবার এখনও সময় হয় নাই।’ তাঁর এও মনে হয়েছে বঙ্গাবাসীর কাছে বহু পরিচিত ব্যক্তিটির পরিচয়ের জন্য জীবনচরিত রচনার কোনো প্রয়োজনীয়তা তখনও পর্যন্ত অনুভূত হয়নি। প্রস্তাবনার দ্বিতীয় স্তরে পাঠকবর্গের কাছে। কিছু প্রতিশ্রুতি বাক্য বঙ্কিমকে আগেই উচ্চারণ করে নিতে হয়েছে। তিনি স্বয়ং। দীনবন্ধুর স্নেহ-ঋণে আবদ্ধ। এজন্য

মন্তব্য

(১) তিনি প্রকৃত জীবনচরিত লেখার চেষ্টা করবেন।

(২) যা লিখবেন তা পক্ষপাতশূন্য ভাবেই লেখার চেষ্টা করবেন এবং

(৩) ঋণ পরিশোধের অযথা চেষ্টা করবেন না। বঙ্কিমের এই প্রতিশ্রুতিবচনে অন্তত নিরপেক্ষ সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভবের সুযোগ আমরা পেয়েছি।

অচিরেই এসে গেছে ঈশ্বর গুপ্ত প্রসঙ্গ। শিক্ষানবিশিকালে ঈশ্বর গুপ্তের কাছে। দীনবন্ধুর ঋণ জমা হয়ে আছে। ঋণ সূত্রে প্রভাব চিহ্ন ধারণের কথাও এসেছে। রঙ্গলাল-বঙ্কিমেরা ঈশ্বর গুপ্তের রুচিবর্ধনকে অতিক্রম করে গেলেও দীনবন্ধু তা পারেন নি। স্বভাবতই দুজনের সমদর্শিতার দিকে দৃষ্টিপাতেরও প্রয়োজন হয়েছে। বঙ্কিম অবশ্য প্রভেদ লক্ষণের উপরই বেশি জোর দিয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্তের লেখায়। ব্যঙ্গ (wit) প্রধান ; দীনবন্ধুর লেখায় হাস্য প্রধান।'.....হাস্যরসে ঈশ্বর গুপ্ত দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন।' তবে দীনবন্ধুর কাব্যচর্চায় অনুপ্রাসের বাহা আড়ম্বরের যে দোষ পাওয়া যায় তা যে গুরু সূত্রে প্রাপ্ত তাতে সন্দেহ নেই।

দীনবন্ধুর সাহিত্য সাধনার ক্রমিক পরিচয় দাখিল ছাড়াও জীবনী অংশের আলোচনায় বঙ্কিম দীনবন্ধুর কর্মজীবন ভূমিকার উপর বিশদ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কলেজ জীবন অতিক্রম করা অবধি দীনবন্ধু ডাক বিভাগের পরিষেবাতেই তার আনুপূর্বিক কর্মজীবন নির্বাহ করেছেন। পেশাগত পারদর্শিতার মূল্যে ইনস্পেকটিং পাোষ্টমাষ্টার পর্বে তিনি উত্তীর্ণ হন। এই কর্মর্দায়িত্ব পালন করার জন্য পূর্বাঞ্চল ডিভিসনের অনেক প্রদেশে ও জেলায় তাঁকে নিরন্তর ভ্রমণ করতে হয়। উচ্চপদাসীন প্রশাসকদের আস্থাও তিনি অর্জন করেন। এই সৎ পরিষেবার যাোগ্য প্রতিদান তাঁর জীবনে আসেনি, তাই বলে তাঁর কর্মজীবন একেবারে মূলধনহীন ও নিস্ফলা ছিল না। কর্মসূত্রে দীনবন্ধু বিভিন্ন শ্রেণির চরিত্রের নিরন্তর সংস্রবে এসেছেন। এতে 'পরিহাস নিপুণ' লেখকের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার সমৃদ্ধ হয়েছে। এরই গুণে 'তাঁহার প্রণীত নাটক সকলে যেরূপ চরিত্রবৈচিত্র্য আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল'।

অভিজ্ঞতা সংস্রবের তাৎপর্যে নদীয়া বিভাগের কর্মরত জীবনের ভূমিকা অপরিসীম। নদীয়া জেলা ছিল নীলকর বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। আর ওই নদীয়া বিভাগে একাধিকবার বদলী হয়েছেন দীনবন্ধু, এককালীনভাবে স্থায়ীও হয়েছিলেন অনেকদিন। স্বভাবতই আন্দোলনের উত্তাপ সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। এখানকার ঘটনাসূত্র ও মানুষজনের আদল নিয়েই তাই সৃষ্টি হয়েছিল 'নীলদর্পণ' নাটক। দীনবন্ধুর স্বভাবত পরদুঃখকাতরতার ফল হিসাবেও বঙ্কিম নীলদর্পণ নাটককে দেখেছেন।

দীনবন্ধুর সৃষ্টি পরম্পরার সাধারণ পরিচয় দিয়েও বঙ্কিম বলেছেন—"আমি দীনবন্ধুর গ্রন্থ সকলের কোনো সমালোচনা করিলাম না। গ্রন্থ-সমালোচনা এ প্রবন্ধে উদ্দিষ্ট নহে; সমালোচনার সময়ও নহে। অথচ দীনবন্ধুর সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থগুলিকে বাঙ্গালা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রন্থ বলেছেন তিনি। একথাও জানিয়েছেন যে, সামাজিক জীবনে পরিদৃষ্ট তাঁর হাস্যরসপটুতার একাংশ মাত্র ধরা আছে তাঁর রচনায়। 'হাস্যরসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন'-এ মূল্যায়ন কিন্তু সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন যার মূল্যও যথেষ্ট। নির্বিরোধী, নিরহঙ্কার মানুষটিকে সমালোচনা কখনো কখনো বিড়ম্বিত করত। তার নীলদর্পণ, নবীনতপস্বিনী, সধবার একাদশীর যশদৃপ্ত প্রচারে ঈর্ষান্বিত বেশ কিছু মানুষ তো ছিলই, তদুপরি চাকরির জন্য উমেদার কিছু নিল মানুষের রাগ তাঁর বিরুদ্ধতার পাল্লাকে ভারি করে তুলেছিল। দীনবন্ধু-নিন্দার অতীব মুখরতার এটি একটা কারণ ছিল বলে বঙ্কিম মনে করেন।

৬.৫ কবিত্ব

কবিত্ব অংশের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর সৃষ্টিপ্রকৃতির অন্তর্ভেদ করেছেন। সৃষ্টি বিশেষ ধরে ধরে তুল্যমূল্য বিচার নয়, দীনবন্ধুর সমগ্র সৃষ্টি সম্ভারের মূল প্রকৃতি নিরূপণই এই অংশের বক্তব্য বিষয়। ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে দীনবন্ধুর সাধর্ম ও সংশ্লিষ্টতা

এতই গভীর যে বঙ্কিমকে দীনবন্ধুর প্রকৃতি বিচারের পদে পদে ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে তুলনার ধারাবাহিক জের টানতে হয়েছে।

বাংলার সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতাকে তাঁর সাহিত্যের বনিয়াদ বলা যায়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশবার অপরিমিত শক্তি ছিল দীনবন্ধুর মধ্যে। ফলত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল বিস্তর। এ জন্যই দীনবন্ধুর রচনায় বিভিন্ন প্রকার মানুষের ভিড়। প্রত্যক্ষতা প্রিয় দীনবন্ধু বিচিত্র মানুষের জীবন্ত মডেল সামনে রেখেই তদের অবিকল প্রতিমূর্তি তৈরি করতেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে idalize করার ক্ষমতাও তাঁর করায়ত্ত ছিল। রাজীবলোচন, নিমচাঁদ, আদুরি, ক্ষেত্রমণি ইত্যাদির বিচিত্রধর্মী চিত্রে দীনবন্ধু এ্যালবাম এই কারণেই ভরে উঠেছে।

সহজাত সৃষ্টি-কৌশলের অধিকারী দীনবন্ধুর স্বভাবধর্মের একটি বিশেষ লক্ষণ রয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমের বিচারে সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটিও একেবারে নজর এড়ায়নি। (১) যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। (২) কিন্তু যাহা সুল, অসাত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাঁর ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। বঙ্কিমের মূল্যায়ন, সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তির অন্তর্ভেদে তাহা তাঁর ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। বঙ্কিমের মূল্যায়ন, সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তির অন্তর্ভেদে দীনবন্ধুর অনায়াস ক্ষমতা ছিল না। অর্থাৎ কিনা, মানবমনস্তত্ত্বের নিগূঢ় অংশে তার দখল ছিল না। বহিরঙ্গ ক্রিয়ার স্ফুটনে বা চরিত্রের বাহ্য আচরণের জায়গায় তাঁর পদচারণা ছিল স্বচ্ছন্দ, অভ্রান্ত।

শুধু অভিজ্ঞতা সম্পদে সৃষ্টি ফলে না, তারজন্য সহানুভূতিরও প্রয়োজন হয়। দীনবন্ধুর সহানুভূতিও ছিল অতিশয় তীব্র। বঙ্কিম সযত্নে লক্ষ্য করেছেন যে, এই সহানুভূতি ছিল সর্বব্যাপিনী। এ বিষয়ে কোন বাছ-বিচারের বালাই ছিল না দীনবন্দুর। শুধু দারিদ্র্য, বেদনা বা বিপর্যয়েই তাঁর সহানুভূতি উদ্ভাবিত হতো না। রুদ্র, রুক্ষ, অগোছালো অনুভূতির সঙ্গে ও সহানুভূতি জুড়তে তাঁর অসুবিধা হতো না। বলা যায়, দীনবন্ধু সহানুভূতি পরবশ মানুষ ছিলেন।

এই পর্বে এসে বঙ্কিমচন্দ্র সহানুভূতি সঞ্চালনের ক্ষমতা অনুসারে সাধারণ সাহিত্যিকদের দুই শ্রেণীতে আবদ্ধ করেছেন। ‘প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি

তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহারাই সহানুভূতির অধীন।.....প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের কল্পনাশক্তি বড় প্রবল ; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রতি দয়াদি বৃত্তি সকল প্রবল।' সূত্রানুযায়ী দীনবন্ধু দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর এই নিয়ন্ত্রণহীন স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতির একটি দুর্লক্ষণও খুঁজে বার করেছেন। দীনবন্ধুর সাহিত্যে রুচিগত অপবাদের ধারাটি দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে। এই রুচিগত দোষ তাঁর শিক্ষাগত বৈগুণ্যের ফল একথা বঙ্কিমের মনে হয়নি। বরং তিনি বলেছেন, 'দীনবন্ধুর রুচির দোষ তাহার ইচ্ছায় ঘটে নাই, তাহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে।' যথাযথ দৃষ্টান্ত দিয়ে বঙ্কিম বুঝিয়েছেন, তোরাপের রাগ থেকে, আদুরির রহস্য পরিহাস থেকে নিমচাঁদের মাতলামি থেকে। তাদের ভাষাকে বাদ দেওয়ার কোনো সায় দীনবন্ধু তার ভিতর থেকে পাননি। অন্য শিল্পীরা যেখানে সামঞ্জস্য সহকারে সংশোধনের প্রয়াসী হতেন, দীনবন্ধু সেখানে অনড়। 'তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরি দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরি, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।'

অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাওয়ার জন্যই 'নীলদর্পণ' দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকের তুলনায় সবচেয়ে শক্তিশালী নাটক হয়ে উঠতে পেরেছে। 'অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মতো শক্তি আর কিছুতেই নাই।' কথাটা যে কত সত্য তা তোরাপ, আদুরি, ক্ষেত্রমণির দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি। বঙ্কিমের সঙ্গে পূর্ণ সহমত পোষণ করে আমরাও বলতে পারি দর্শক বশীকরণের ক্ষমতায় নীলদর্পণের সত্যই কোনো জুড়ি নেই।

উপসংহার পর্বে এসে বঙ্কিম এক যথাযোগ্য দাবি পেশ করেছেন। দীনবন্ধু সম্বন্ধে যা তিনি বলেছেন বা প্রতিপাদন করেছেন তা বই পড়ে একটা আন্দাজি theory খাড়া করা নয়। 'গ্রন্থকারের হৃদয় আমি বিশেষ জানিতাম, তাই এ কথা বলিয়াছি ও বলিতে পারিয়াছি। যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে পাইয়াছি, গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি বলিয়া একথা বলিলাম। গ্রন্থকারকে না জানিলে, তাহার গ্রন্থ এরূপে বুঝিতে পারিতাম কিনা বলিতে পারি না।' পরিষ্কার বোঝা গেল, সৃষ্টির অন্তর্ভেদের প্রকৃত জোরটা তিনি কোথায়

পেয়েছেন। স্রষ্টার সঙ্গে মানসিক বোঝাপড়ার সেতুবন্ধন থাকার জন্যই সৃষ্টি রহস্য ভেদ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত বিষয়ক রচনার প্রতিধ্বনি এ প্রবন্ধে আবার পাওয়া গেল। অতঃপর বলা যেতে পারে, বঙ্কিম সমালোচনা বা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটা নিজস্ব পদ্ধতির হকদার। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার জীবনীসূত্রকে জড়িয়ে নিয়ে তবেই মূল্যায়নে যাওয়া উচিত, এই ঔচিত্যের জনক বলা যায় বঙ্কিমকে।

৬.৬ প্রতিপাদন

ক. সামাজিক বহুদর্শিতাই দীনবন্ধু সাহিত্যের আসল বনিয়াদ। ডাকবিভাগের বদলি চাকরির সূত্রে বহু অঞ্চল ভ্রমণ এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ মেলামেশারদৌলতে যে অভিজ্ঞতা দীনবন্ধু মিত্র অর্জন করেছিলেন তারই প্রতিচ্ছবি তাঁর নাটকসমূহ।

খ. হাস্যরসের উপর দীনবন্ধুর অধিকার এক তুলনারহিত ব্যাপার। এ বিষয়ে তিনি ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী।

গ. দীনবন্ধু উচ্চপ্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন না। সহানুভূতিকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করার রাশ তাঁর হাতে থাকলে তিনি সুদক্ষ লেখক হয়ে উঠতে পারতেন।

ঘ. স্বতঃস্ফূর্ত সর্বব্যাপী সহানুভূতির জন্য মানবচরিত্রকে আদ্যন্ত প্রত্যক্ষবৎ করে ভোলা যেমন তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, তেমনি স্থানবিশেষে রুচিবিপর্যয়ের কবলিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। নিম্ন গোত্রের চরিত্রে পরিমার্জনা না করার জন্য ভাষা ও আচরণে রুচিদোষ অব্যাহত ছিল। ব্যক্তিগত রুচিজ্ঞানের অভাব নয় সর্বব্যাপী সহানুভূতির জন্যই এরূপ রুচিবিভ্রম ঘটেছিল, বঙ্কিম এমনটা মনে করেন।

৬.৭ সমালোচনার দৃষ্টিকোণ

বঙ্কিম বলেছেন বটে ‘গ্রন্থ-সমালোচনা এ প্রবন্ধে উদ্দিষ্ট নহে; তথাপি ব্যক্তিমানুষ ও তার স্বভাবধর্মকে সঙ্গে নিয়েই তিনি দীনবন্ধুর সৃষ্টি প্রকৃতির অন্তর রহস্য আবিষ্কার করতে

চেয়েছেন। এই পন্থাতেই দীনবন্ধুর সৃষ্টিধর্মের দুটি অমূল্য সূত্র উদ্ধার হয়েছে, যা এতাবৎ কাল পর্যন্ত দীনবন্ধুর প্রতিভা রহস্য উদঘাটনের মূল চাবিকাঠি বলে গণ্য হয়ে এসেছে। সূক্ষ্ম সুকোমল চিত্তবৃত্তির চেয়ে খূল রুক্ষ উপাদানেই দীনবন্ধুর অধিকার বেশি, এই তত্ত্বের জোরেই দীনবন্ধুর চরিত্রাঙ্কনের বৈপরীত্য রহস্যের ভেদ হয়। ললিত, লীলাবতী, নবীনমাধব, গোলোক বসুর তুলনায় তোরাপ, নদের চাঁদ, নিমচাঁদ ক্ষেত্রমণিরা কীসে জীবন্ত তা নিয়ে আর আমাদের মাথাব্যথা থাকে না।

প্রথম শ্রেণির লেখকরা সহানুভূতি বা কল্পনাকে নিজের বশে রাখতে পারেন, অপেক্ষাকৃত দুর্বল লেখকরা সহানুভূতির নির্দেশ চালিত হন, এই সূত্রোল্লেখের সাহায্যেও বঙ্কিম বাজিমাত করেছেন। প্রথমত দীনবন্ধুর প্রতিভার সঠিক মান নিরূপণ সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত সহানুভূতির কাছে আত্মসমর্পণের জন্য দীনবন্ধুর রচনার শক্তি এবং দোষ একাধারে নির্ণীত হয়েছে। রুচিদোষের জন্য স্বেচ্ছাস্বাধীন সহানুভূতিকে দায়ী করে বঙ্কিম পরোক্ষ একথা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, রুচিদোষে অভিযুক্ত চরিত্রগুলি থেকে তাদের ভাষা ও আচরণকে বাদ দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাহলে আধখানা চরিত্রের কাছে দীনবন্ধুর অঙ্কিত চরিত্রের পূর্ণ মজাটুকু পাওয়া যাবে না।

ঈশ্বর গুপ্ত বিষয়ক রচনার মতোই এ প্রবন্ধে নান্দনিক সূত্রের পুনরুচ্চারণ রয়েছে। গ্রন্থকারকে যদি সমালোচক সামাজিক হৃদ্যতার বন্ধনে পান তবে সৃষ্টিকর্ম অনুধাবনে বাড়তি সাহায্য পাওয়া যায়। ব্যক্তি মানুষটির পরিচিত স্বভাবের সঙ্গে তাঁর রচনা স্বভাবের জোড়া লাগলে স্রষ্টামানুষের পূর্ণতর পরিচয় প্রকাশ পায়। দীনবন্ধু বঙ্কিমের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। সুতরাং সামাজিক সংস্রবে পূর্বাহ্নেই তাঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমের স্পষ্ট পূর্বানুমান ছিল। দীনবন্ধুর সাহিত্যে তারই প্রতিফলিত রূপ দেখতে পেয়ে সমালোচক বঙ্কিম যৎপরোনাস্তি খুশি হয়েছেন।

বাহ্য সংশ্লিষ্টতার বাঁধনকে সমালোচক কাটিয়ে উঠতে পারেন কিনা এ এক মহৎ পরীক্ষা। ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধু দুজনেই বঙ্কিমের প্রিয়জন ছিলেন। অথচ এই দুজন সম্বন্ধেই কমবেশি অনেক অভিযোগ। এঁরা কেউই প্রতিষ্ঠিত যশস্বী লেখক ছিলেন না। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার ভারসাম্য রাখা কঠিন কাজ। বঙ্কিম কিন্তু সংযম নিরপেক্ষতার

সঙ্গেই এ দায়িত্ব পালন করেছেন। এঁরা যতটা অবাঞ্ছিত বলে বিবেচিত, ইতিহাসের ভূমিকায় ততটা উপেক্ষণীয় অবশ্যই নয়। সুতরাং লোকোপবাদের আবর্জন ঠেলে স্বচ্ছ মনে তাঁদের মূল্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। এজন্য যথাযথ অবস্থানে রেখেই এঁদের মান্য করা দরকার। মধ্যমানের লেখক দীনবন্ধু সম্বন্ধে তাঁর বিচার ওই নিরপেক্ষতার মানেই সুচিহ্নিত।

৬.৮ অনুশীলনী

১।রায় দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করো।

২।রায় দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্য প্রতিভা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কি বলেছেন?

৩।এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য কি?

৪।এই প্রবন্ধে দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?

৫।প্রবন্ধটির সমালোচনার দৃষ্টিকোণ আলোচনা করো।

৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত- বঙ্কিমচন্দ্র ১৯২০

অজরচন্দ্র সরকার -বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য -বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

অলোক রায় -প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ মন

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়- সমালোচনা রূপরেখা,বঙ্কিম পর্ব

প্রমথনাথ বিশী- সাহিত্যচিন্তা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একক ৭ - আত্মচরিত - শিবনাথ শাস্ত্রী

বিন্যাসক্রম

৭.১ ভূমিকা

৭.২ লেখক পরিচিতি

৭.৩ আত্মজীবনী কী ও কেন

৭.৪ শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত – আলোচনা

৭.৫ আত্মচরিত গ্রন্থ অবলম্বনে শিবনাথ শাস্ত্রীর দাদু-দিদিমার পরিচয়

৭.৬ আত্মচরিত গ্রন্থ লেখক এর প্রপিতামহের ধর্ম ভাব

৭.৭ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ এবং ব্রাহ্মচেতনা বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর ভূমিকা

৭.৮ শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত ‘আত্মচরিত’ গ্রন্থটি আত্মজীবনী সাহিত্যরূপ কতখানি সার্থক

৭.৯ ইংল্যান্ড যাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছিলেন তার পরিচয়

৭.১০ সংক্ষিপ্ত ও অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

৭.১১ অনুশীলনী

৭.১২ গন্থপঞ্জি

৭.১ ভূমিকা

শিবনাথ শাস্ত্রীর অন্যতম একটি গ্রন্থ 'আত্মচরিত'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তার কন্যা হেমলতা প্রমুখ তাকে জীবনীরচনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ আত্মজীবনী লিখেছিলেন। প্রথমাবধি শিবনাথ অরাজি হলেও মৃত্যুর একবছর আগে তিনি নিজের জীবনচরিত রচনায় মনোনিবেশ করেন। তার ঐকান্তিক উপলব্ধি, তথ্যনিষ্ঠা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে। তিনি বাঙালি পাঠকদের উপহার দিয়েছিলেন এই মূল্যবান গ্রন্থটি। তার ডায়ারি, প্রাপ্ত প্রদত্ত চিঠিপত্র, সমসাময়িক পত্রিকার তথ্য এই আত্মচরিতটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

৭.২ লেখক পরিচিতি

"শিবনাথ শাস্ত্রী ভারতবর্ষের একজন প্রথম সারির চিন্তাবিদ, ধর্মনেতা, সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিক ছিলেন।"—(বারিদবরণ ঘোষ / শিবনাথশাস্ত্রী-গ্রন্থের ভূমিকা, সাহিত্য আকাদেমি) | আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণের এমন একজন বিশিষ্ট মানুষ, যাঁর জীবন ও সাধনায় উনবিংশ শতকের ধর্মীয় আন্দোলন, সমাজের প্রগতি এবং সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তার আনুপূর্বিক বুতান্ত রয়ে গেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মজিলপুর গ্রামে হরানন্দ ভট্টাচার্য এবং গোলোকমণি দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য)। তাদের বংশের পূর্বপুরুষ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ উগাতা। প্রপিতামই, তা এবং মাতার কাছ থেকে শৈশবে শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ পেয়েছিলেন তিনি। দিকে মাতামহ এবং বড়মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের প্রভাবও তার জীবনে কম নয়। লেবেলায় গ্রাম্য পাঠশালা, লর্ড হার্ডিঞ্জের মডেল স্কুল এর পাঠ শেষ করে তিনি পিতার সঙ্গে কোলকাতা চলে আসেন সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনার জন্য।

এসময় তার প্রসন্নময়ীদেবীর সঙ্গে প্রথমবার বিবাহ হয়। তখন তার বয়স বারো তেরো বছরের বেশি নয়। যদিও প্রথমা স্ত্রীকে বাড়ির চাপে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন বিরাজ মোহিনী দেবীর সঙ্গে। এরফলে তার মানসিক অস্তিরতা তৈরি হয় এবং এই সময় থেকেই তিনি ঈশ্বরমুখী হন ও পড়াশোনায় আগ্রহী হয়ে এম.এ পরীক্ষায় বসেন। এম.এ পরীক্ষায় পাস করে তিনি ৫৯ টাকা স্কলারশিপ পান। এই টাকার সে ভাগটাই পরোপকারে কাজে লাগতো। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি এমএ পাস করে 'শাস্ত্রী' উপাধি পেলেন। কর্মজীবনে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় যোগদান করেছিলেন তিনি।

ছাত্রাবস্থা থেকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং ভারতীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে কেশবচন্দ্রের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। তারপর শ্যামবাজারে ব্রাহ্মসমাজ, পারিবারিক সমাজ বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য প্রচারকার্যে পরিভ্রমণ করেন। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ভাষায় সুনিপুণ বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমত প্রভৃতি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। এসময় তিনি ইংলন্ডেও ধর্মপ্রচারের জন্য গিয়েছিলেন তবে সেখানে অল্পদিন কাটিয়ে ভারতে ফিরে আবার মাদ্রাজে যান। পরবর্তীতে ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই পরিভ্রমণ করেছিলেন শিবনাথ। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আগ্রহী ব্রাহ্মসভ্যদের নিয়ে তিনি গঠন করেছিলেন 'সাধনাশ্রম'।

কেশবচন্দ্রের বালিকা বিদ্যালয়, হরিনাভি স্কুলের সম্পাদক ও প্রধানশিক্ষক, ভবানীপুর সাউথ সুবার্বান স্কুলের প্রধান শিক্ষক, হেয়ার স্কুলের 'Head Pandit Cum Translalor Master' সিটি স্কুলে শিক্ষকতা, সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদনা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়, শিশু ও মহিলাদের শিক্ষাদান প্রভৃতি কর্মেও সল প্রাণবন্ত—শিবনাথ শাস্ত্রীকে লক্ষ্য করা গেছে। নানাবিধ সমাজসেবামূলক কাজ যেমন বিধবা বিবাহ আন্দোলন, দুর্গতদের আশ্রয়দান, পুরসভা ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে। মানুষকে পরিষেবা প্রদানের জন্য পত্রিকার প্রতিবেদন, মদ্যপানের কুফল বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি সমাজ মানুষের জন্য আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। স্বদেশপ্রেমের জাগরণ মন্ত্র, সাম্য, মৈত্র, স্বাধীনতার বাণী প্রচারের ক্ষেত্রেও তাঁর নামটি স্মরণীয়।

বিলাতে গিয়ে আসামের কুলী আন্দোলন নিয়েও তিনি সরব হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তার কথায় ছাত্রসমাজ উদ্দীপিত হয়েছিল। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলনেও তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। কারাবন্দী ফাঁসির আসামী কানাইলাল দত্তকে কারাগারে গিয়ে মানসিক শান্তির বাণীও শুনিয়েছিলেন তিনি। তার স্বদেশপ্রেম অখণ্ড ভারতবোধের সঙ্গে একাত্মীভূত।

সাহিত্যসৃষ্টিতেও তিনি পারদর্শিকতার পরিচয় দেন। ছোটোবেলায় কবিতার মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টিতে হাতেখড়ি হলেও পরবর্তীকালে তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস, নানা প্রবন্ধ গ্রাদ্ধ, শিশু সাহিত্য, নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে কয়েকটি—'নির্বাসিতের বিলাপ' (কাব্যগ্রন্থ), 'পুষ্পমালা' (কাব্যগ্রন্থ), 'পুষ্পাঞ্জলি' (কাব্যগ্রন্থ), 'মেজবউ' (উপন্যাস), 'যুগান্তর' (উপনস), 'নয়নতারা' (উপন্যাস) 'আত্মচরিত' (জীবনীগ্রন্থ), 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (প্রবন্ধ গ্রন্থ) 'স্বনামা পুরুষ' (শিশুপাঠ্য), ছোটদের গল্প প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল তার সুচিন্তিত মতামত। সোমপ্রকাশ, সমালোচক,তত্ত্বকৌমুদী, সখা, মুকুল প্রভৃতি পত্রিকায় আমরা অক্লান্ত পরিশ্রমী এক সম্পাদককে পাই।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, শিক্ষকতা, সাহিত্যসৃষ্টি, পত্রিকা সম্পাদনা, ব্রাহ্মমন্দির নির্মাণ, দেশ ও বিদেশের নানানে ভ্রমণ এইরকম পরিশ্রমে তার শরীর ক্রমশ অসুস্থ হতে লাগল অবশেষে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি ইহলোকের মায়া কাটিয়ে অমৃতের সন্ধানে চিরযাত্রা করেন।

৭.৩ আত্মজীবনী কী ও কেন

...আপনাকে objectify করে আত্মচরিত লেখা বড়ই শক্ত। কত স্তরে স্তরে যে আমার 'আমিত্ব' ডুবে আছে, তাকে টেনে তোলা অসম্ভব। জীবন-চরিত লেখকই বা অপরের জীবনের। কতটুকু দেখতে পান যে, তিনি যথাযথ ভাবে 'চরিত' টা আঁকবেন? জীবনচরিত লেখা (তা স্বরচিতই হোক্ বা অপরের রচিতই হোক) দুই-ই অসম্ভব।

(রবীন্দ্রনাথের সহিত কথোপকথন/ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৪)

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' নামে আত্মজৈবনিক রচনা লিখলেও জীবন থেকে বৃত্তান্ত বাদ দিয়েছিলেন। তিনি কবির রচনা থেকে জীবনের বিকাশ খুঁজতেন, ঘটনা ও তথ্য পছন্দ করতেন না। যে জন্য তিনি টেনিসনের জীবনী কিংবা ম্যাক্সিম গোর্কি রচিত টলস্টয়ের জীবনী পড়ে খুশি হননি। প্রশ্ন তুলেছিলেন, "গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়? (দ্র, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি)। আর টেনিসনের জীবনীপাঠে তার প্রতিক্রিয়া, ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে।" (দ্র. কবিজীবনী)।বলা বাহুল্য, এই অভিমত একান্ত ভাবে রাবীন্দ্রিক। তিনি সেই মানুষ, যিনি নির্দ্বিধায় বলেন। 'আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম' (দ্র. আত্মপরিচয়)। যদিও সাধারণ পাঠক বৃত্তান্ত না জেনে স্বস্তি পায় না। লেখক-কবি-শিল্পী-মনীষী কিংবা মহাপুরুষের জীবনের অন্দরে, আনাচে কানাচে কী কী রহস্য গোপন আছে তা জানার কৌতুহল সকলেরই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন,

'আমাদের, প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো কবির জীবনচরিত নাই। আমি সেজন্য চিরকৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি।' (কবিজীবনী/সাহিত্য)

তবু তার মিনতি ছিল, 'বাহির হইতে দেখো না এমন করে আমায় দেখো না বাহিরে।'

জীবনী দু'ধরনের। একদিকে মনীষী, কবি, শিল্পী, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ প্রমুখের জীবনী (Biography) লেখা হতে পারে। আরেকটি হল মহাপুরুষ, সাধক, ভক্ত প্রমুখের জীবনী (Hagiography)। শেষোক্ত জীবনীতে অনেক জনতি, অলৌকিক ঘটনা মিশে থাকে। প্রকৃত জীবনীতে আমরা চাই বাস্তবতা, তথ্য ও সত্য। যা দিনলিপি, চিঠিপত্র ও সাক্ষাক্কার ইত্যাদির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে 'রামায়ণ'ই প্রথম জীবনী বা চরিতকথা। ব্রহ্মা কবি বাল্মীকিকে নরচন্দ্রমা রামের জীবনী লিখতে বলেছিলেন—"রামস্য চরিতং কৃৎ গং কুরু প্রমুষিসত্তম ধর্মাত্মানো গুণবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ। বহু বছর পরে অশ্বঘোষ লেখেন "বুদ্ধচরিত" কাব্য। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবকে ঘিরে একাধিক চরিতকাব্য লেখা হয়। আসলে যা 'চরিতামৃত'। সন্ত জীবন কাব্য বলা যায়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে যেসব বাংলা গদ্যগ্রন্থ

প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানেই প্রথম গদ্যকারে জীবনকথা পাই। যেমন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং; বা রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। তবে এখানে ইতিহাস ও জনশ্রুতি তথ্যের স্থান অধিকার করেছে। তুলনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের "জীবনবৃত্তান্ত" বা রামপ্রসাদের "জীবনবৃত্তান্ত" তথ্য সংগ্রহ করে লেখা। পরবর্তীকালে জীবনী সাহিত্য বিশ শতকে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রামাণ্য তথ্যসহ অনেক জীবনী লেখা হয়েছে। প্রশান্ত কুমার পালের, "রবিজীবনী", গোলাম মুরশিদের "আশার ছলনে ভুলি", প্রভাতকুমার দাসের "জীবনানন্দ দাশ" অরুণকুমার বসুর "নজরুল-জীবনী" তার দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রমিত্রর "করুণাসাগর বিদ্যাসাগর" অত্যন্ত প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ।

স্বরচিত যে-জীবনকথা তাকেই আমরা আত্মজীবনী আখ্যা দিতে পারি। একদা মঙ্গলকাব্যে কবিরা গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ দিতে গিয়ে আত্মপরিচয় দিতেন—কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রূপরাম, আলাওল প্রমুখের কাব্যে তার পরিচয় আছে। কৃত্তিবাসও রামায়ণ-পাঁচালি রচনা করতে গিয়ে আত্মকথা লিখেছেন। এগুলি যথাযথ আত্মজীবনী নয়। উনিশ শতকে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ই প্রথম আত্মজীবনী লেখেন। পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী', কেশবচন্দ্র সেনের, "জীবনবেদ', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' লিখিত হয় এবং ১৮৯৮ খ্রি. থেকে ১৯০৯ খ্রি. পর্যন্ত সময়সীমায় প্রকাশিত হয়েছিল।

আত্মচরিতর রচনায় মহিলাদেরও অগ্রণী ভূমিকা দেখা যায়। যেমন- রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন', বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা', সরলাদেবী চৌধুরাণীর জীবনের ঝরাপাতা, মানকুমারী বসুর 'আমার অতীত জীবন, সুদক্ষিণা সেনের জীবনস্মৃতি', সাহানা দেবীর 'স্মৃতির খেয়া', রানী চন্দের জেনানা ফাটক' ইত্যাদি।

আরেক ধরনের আত্মজীবনী আছে, যা মুখ্যত বাল্যস্মৃতি নির্ভর। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা', শরৎচন্দ্রের 'বাল্যস্মৃতি', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, 'আমার বাল্যকথা', গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বাল্যজীবন', বুদ্ধদেব বসুর 'আমার ছেলেবেলা', পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' ইত্যাদি।

স্বদেশি বিপ্লবী বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও আত্মকথা লিখেছেন। যেমন বারীন্দ্র ঘোষের 'দ্বীপান্তরের কথা', উল্লাসকর দত্তের 'কারাজীবন', অনন্ত সিং-এর 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' ইত্যাদি। পুলিশ/দারোগারা যেসব আত্মজীবনী লিখেছেন, তার মধ্যে ধীরাজ ভট্টাচার্যের 'যখন পুলিশ ছিলাম', রুণু গুহ নিয়োগীর 'সাদা আমি কালো আমি" ইত্যাদির কথা বলা যায়।

বিদ্যাসাগরের 'বিদ্যাসাগর চরিত', মীর মশাররফ হোসেনের 'আমার জীবনী', বিপিনচন্দ্র পালের 'সত্তর বছর', সুকুমার সেনের 'দিনের পর দিন যে গেল' আত্মকথা ও স্মৃতিকথার দৃষ্টান্ত। জসীমুদ্দিনের 'জীবনকথা' কবির আত্মজীবনী।

অধ্যাপক শিশির কুমার দাশ তাঁর রচিত "আত্মজীবনীঃ জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে জীবনীকারের কাছে তার প্রত্যাশা কী বলেছেন,—"জীবনীকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা সততার। এছাড়াও খ্যাতিমানের আকর্ষণীয়তাকে দিয়ে পাঠককে কৌতুহলী করে তোলা। গোয়েন্দার মতো ব্যক্তিজীবনের খুঁটিনাটি খোঁজা বা জেনেটিক্স বিশ্লেষণ সর্বদা শোভন হয় না। অধ্যাপক দাশ মনে করেন, জীবনীকার-কে তো শেষপর্যন্ত একটি জীবনকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

অন্যদিকে, আত্মজীবনী প্রসঙ্গে তার বক্তব্য একটু রূঢ় শোনালেও সত্য ভাষণ মনে হয়।

আত্মজীবনীতে নিজের বাহাদুরির কথা লেখা হয় না তা নয়, নিজের স্খলন-পতন নিয়েও যে আস্ফালন করা সম্ভব অনেক আত্মজীবনী তার নিদর্শন। সত্য ভাষণ ও অহমিকার প্রকাশ হতে পারে। তাই আত্মজীবনীর পথ। যথার্থই দুর্গম এবং ক্ষুরধার।

মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথা সত্যের সঙ্গে জড়িত। সেজন্য তিনি বলতে পারেন "আমার জীবনই আমার বাণী।" তা সকলের পক্ষে বলা অসম্ভব এবং আশোভনও।

আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথার তুলনামূলক আলোচনায় অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেন, স্মৃতিচারণ মানুষ তার 'দেশ ও কালের পর্বে তার চেনাজানা অনেক মানুষ ও তাদের পরিবেশকে ধরার চেষ্টা করে।' যা হয়ত ইতিহাসের উপাদানও। আত্মকথায় কীভাবে দুটি কালের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ফুটে ওঠে, তার দৃষ্টান্ত, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত"

ও তারাশঙ্করের 'আমার কালের কথা' ও 'আমার সাহিত্য জীবন'। অনেক সময় "আত্মকথায় 'আত্ম' আর 'পর'-এর ভারসাম্য থাকে না, এটাও দেখেছেন।

৭.৪ শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত - আলোচনা

আজ থেকে একশো তিয়াত্তর বছর আগের লেখা "শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত" আজ কেমন বিস্ময়কর মনে হয়। সেকালের সমাজ ও সংস্কৃতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে আজ এই পোস্ট মডার্ন যুগে চমকে উঠি। এক আত্মচরিতের পাতায় পাতায় যে যুগের মানুষ—সমাজ ও চর্যার পরিচয় পাই—আর আজ এই প্রেক্ষিতে, প্রতিদিন কলেজের শ্রেণিকক্ষে গিয়ে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে পাঠ্য বিষয়ের পর্যালোচনা করি। তাদের সংযোজক হিসেবে আমি যেন এক ছায়া মানুষ: আমারই যেন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। শিবনাথ শাস্ত্রীর সময় ও সমকালের সঙ্গে আজকের সময়ের যেন গ্রহান্তরের পার্থক্য। সেদিনের হিন্দু সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ পরিবার, তাদের চর্যা আর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা ব্রাহ্মসমাজের নতুন চেতনার আলো। আর আজকের বাংলা জাতপাত হীন ব্রাহ্মণ শাসন রহিত বাঙালি সমাজ—এ যেন দুই মেরুর পার্থক্য।

আত্মচরিতের সবচেয়ে বেশি অংশ ব্রাহ্মসমাজ গড়ে ওঠা, তার ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস বর্ণনায় ব্যয়িত হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একজন আদর্শ ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক—পৃষ্ঠপাোষক হিসেবে তার আত্মকথা লিখেছেন। অথচ এই দীর্ঘ। প্রবন্ধে কোথাও কোনো ধর্মাচরণ পদ্ধতি, উপাসনা পদ্ধতির পানপুখ পরিচয় নেই। বইটি কলকাতার প্রবাসী কার্যালয় থেকে ১৯১৮-য় প্রকাশিত হয়। ১/৮ ডিমাই সাইজের চারশো বিয়াল্লিশ পাতার বই। ১৮৪৭ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত তার জীবকালের চরিতকথা। ১৯১৯-এর ৩০ সেপ্টেম্বর শিবনাথের মৃত্যু হয়।

শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম চব্বিশ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের মজিলপুর গ্রামে, ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি রবিবার। বাংলা ১৯ মাঘ ১২৫৩ সালে। তিনি ছেলেবেলায় তার পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মাণ প্রপিতামহ রামজয় তর্করত্নের সংস্পর্শে এসেছেন, যিনি ১০৩

বছর জীবিত ছিলেন। তিনি যদিও তখন বার্ধক্যের ভারে পীড়িত ও ধ্বস্ত। তবু আপন বংশের উত্তরাধিকার শিবনাথের প্রতি সমস্ত স্নেহ, বাৎসল্য ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বর্ষিত করে গিয়েছেন সমস্ত শক্তি দিয়ে। প্রতিদিনের পূজা ও তর্পণের স্মৃতি দিয়েই শিবনাথ শাস্ত্রীর আচরিতের প্রথম অধ্যায় সজ্জিত। ন্যায়রত্ন মহাশয় পটলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ মল্লিক পরিবারের কুলপুরোহিত ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত ও আচার্য। তারই পুত্র রামকুমার ভট্টাচার্য শিবনাথের পিতামহ এবং হরানন্দ ভট্টাচার্য পিতা। যদিও আত্মচরিতের কোথাও হরানন্দ ভট্টাচার্যের নামোল্লেখ করেননি শিবনাথ।

মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত টোল চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। তার পুত্র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সেকালের বিখ্যাত ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকার সম্পাদক। এই মামার প্রভাব শিক্ষা ও সাহসিকতায় শিবনাথকে প্রভাবিত করেছিল। শিবনাথ সোমপ্রকাশে অনেক কবিতা ও অন্যান্য রচনা প্রকাশ করেছেন। সেকালে পিতৃ ও মাতৃ উভয়কুলের বামণ পরিবারের পিতামহী ও মাতামহীর সাহস, বীরত্ব ও দয়া পরায়ণতার উল্লেখ করেছেন শিবনাথ, যা যথার্থই উত্তরাধিকার সূত্রে শিবনাথের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। শিবনাথের জন্ম হয়েছিল মাতুলালয়ে চাংড়িপোতা গ্রামে, মাতামহীর কোলে। দু’বছর বয়সে মামাবাড়ি থেকে নিজের বাড়ি মজিলপুরে আসেন শিবনাথ। মায়ের উনিশ বছর বয়সে তার জন্ম। হয়। সেকালে ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানদের বাল্যেই দু-তিন বছর বয়সেই অন্য একটি কন্যার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে থাকত। পরে দশ/বারো বছর বয়ক্রমে তাদের। পরস্পরের বিয়ে হত। এরকম বাগদত্তার স্বামী মারা গেলে তাকে ‘অন্যপূর্বা’ বলা হত। এত কম বয়সে বিবাহের ঠিক হওয়া ও বিয়ে হওয়া আমাদের কাছে কীরকম মধ্যযুগীয় হিন্দু কুসংস্কার মনে হয়। এই আত্মচরিতে শিবনাথ যে সমস্ত কথা অকপটে স্বীকার করেছেন, তা আমাদের পোস্ট মর্ডান শিক্ষিত মুখোশ আভিজাত্যে কিরকম অপমানজনক মনে হয়। তার পিতা তাকে যেভাবে নির্মম প্রহার করতেন। ব্রাহ্মণ সন্তান হিসেবে, ব্রাহ্ম হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি যেসব হিন্দু ব্রাহ্মণের সংস্কার মেনে চলতেন, তা পড়তে গিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছি। জেদ বা একগুয়েমি ব্যক্তিগতভাবে আমারও উত্তরাধিকার। বাবার হাতে ছেলেবেলায় আমিও মার খেয়েছি।

কিন্তু জীবনে একবার। এবং সেই একবার আমাকে মারতে গিয়ে বাবার হাত কেপে উঠার ছবি আজও আমাকে পীড়িত করে। কিন্তু হরুঠাকুর তার এই সন্তানকে যেভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করতেন, তা। কোথাও যেন অমানবিক ও হৃদয়হীন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় মানসিকতা। শিবনাথের ভাষায় : কারণ তিনি সামান্য সামান্য কারণে আমাকে ভয়ানক মারিতেন। আবার যে মা শিবনাথের জন্য এমন কাতর ছিলেন, সেই : "মা আমাকে ধরিয়া দুইখানা খোলার কুচি একত্র করিয়া আমার গালের মাংস ছিড়িয়া ফেলিলেন; রক্তে মুখ ভরিয়া যাইতে লাগিল। তৎপরে কয়েকদিন আহার বন্ধ হইলে, মা আমার গলায় চালানো ভাত ও দুধ ঢালিয়া দিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই দিন অবধি জননীর প্রতি গালাগালি আমার মুখে কেহ কখনও শোনে নাই।' যদিও সেকালে গ্রামের ছেলেরা মাকে 'পাটি' বলে গালাগাল দিত।

ছেলেবেলার স্মৃতিতে মার্ক টোয়েন তার আত্মকথা'য় যে সীমাহীন গাঁজাখোর গল্প শুনিয়েছেন, তার বিপ্রতীপে শিবনাথের আত্মচরিত এক আদর্শ গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি বা ছেলেবেলায়ও যে পরস্পর সামঞ্জস্যহীন সময়কালের বিমিশ্রণ লক্ষ করা যায়, তাও শিবনাথে কখনই ঘটেনি। সুন্দর ক্রম অনুসরণের দৃষ্টান্ত এই আত্মচরিত।

পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় বর্ধমেনে গুরুর কাছে তালপাতায় লিখে শিবনাথের পড়া শুরু হল। তার মাতৃকুলের উত্তরাধিকার স্বীকার করে শিক্ষিতা মায়ের সহায়তায় শিবনাথ সেই বয়সেই অন্যান্য ছাত্রদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকলেন। তার বাবাও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রিয় মানুষ।
শিবনাথকে পরে হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলে ভর্তি করা হয়। এখানে স্কুল বুক সোসাইটির বর্ণমালা ও মদনমোহনের শিশুশিক্ষা বই পড়ানো হত। ১৮৫৬-র আষাঢ়ে প্রথম বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। ছেলেবেলায় গ্রামজীবনের নানা ঘটনা বেশ আকর্ষণীয়। বিশেষত পাখি ধরার নানা পদ্ধতি ও পাখি পোষার ইচ্ছে, কুকুর ও বিড়াল পোষা আর একটি মাদি কুকুরের দুরন্ত বুদ্ধি, গরু চরানোর কাহিনী শিবনাথের ছেলেবেলাকে যে কোনো শহরবাসী মানুষের জীবনের থেকে আলাদা করে দেয়। পরবর্তী জীবনের মানবপ্রীতি ও পরোপকারের উৎসের এই ছেলেবেলা বেশ অনন্য।

টুনটুনি, বুলবুলি, দোয়েল, ছাতারে, শালিক, টিয়া, এমনকি ফড়িং ও পিপড়ের প্রতি শিবনাথের বাল্যের অনুসন্ধিৎসা বিস্ময়কর। আর এই সুবাদে বালক শিবনাথের ঢিল ছুঁড়বার দৃষ্টিও ছিল সুলক্ষ। একই সঙ্গে নিজের এই বয়সের তন্ময়তাও বেশ উল্লেখ্য। গ্রামের ইঞ্জিনিয়ার। পাোলবন্দী সাহেবের হাতির সামনে পড়েও নিমগ্নচিত্তে গাছের পাখির প্রতি তার একনিষ্ঠার জন্য হাতিও শুড় দিয়ে বালক শিবনাথকে ধরবার চেষ্টা করেছে। আর তাত অনুসন্ধিৎসা এই বয়সের এতই তীব্র ছিল তা তার শেষ বয়স পর্যন্ত তাকে নিজের সংকল্পে একনিষ্ঠ করে তুলেছে।

প্রপিতামহের ধর্মাভাব চিরস্মরণীয়। তিনি প্রতিদিন প্রাতে দেড় ঘণ্টা জপতপ-পূজা দিতে ব্যয় করতেন। প্রথম এক ঘণ্টা দেবদেবীর পূজন ও জপ। তারপর আধ ঘন্টা পিতৃপুরুষের তর্পণ। পরে আধ ঘণ্টা মাটিতে মাথা ঠুকিয়ে ইষ্ট দেবতার চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা। এই প্রার্থনায় তার কপালের উপরে একটা আবের মতো মাংসপিন্ড ফুলে উঠে ছিল। মাথা ঠুকে প্রার্থনার সময় তিনি বলতেন 'মা মা হারুর সুমতি করে দাও।' এইখানে আত্মজীবনীতে শিবনাথ শাস্ত্রী নিজের বাবার নাম ‘হারু’ বলে প্রপিতামহের উক্তিতে উল্লেখ করেছেন। অন্য কোথাও আর বাবার নাম লেখেন নি। তারপর প্রপিতামহ করতালি দিয়ে নাচতেন এবং ‘বাবা আমি তখন দিগম্বর মূর্তি বালক, মা আমাকে খেলার ভিতর হইতে ধরিয়া আনিতেন।’ শিবনাথ এই উত্তরাধিকার বলে ব্রাহ্ম হয়েও নিয়মিত উপাসনা ও প্রার্থনা করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। প্রপিতামহ বালক শিবনাথের জ্বর-জ্বালা-পীড়া মন্ত্র পড়ে, ফুঙ্কার দিয়ে, হাত বুলিয়ে সারিয়ে দিতেন। এতে তার রোগ সেরেও যেত। এমনকি ব্রাহ্ম হয়ে উপবীত ত্যাগ করলেও একবার যক্ষা রোগের সূচনা হলে তার মা তার প্রপিতামহের লাঠি, যোগপট্ট ও মালা এনে তার বিছানায় রেখে দিয়েছিলেন। এমনকি রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিন মাস কাল এসব তার শয্যাতেই ছিল। পরবর্তীকালে প্রপিতামহের পরলোকগমনের পর তার আহারের বাটি শিবনাথ ব্যবহার করেন চিরকাল ধরে।কলকাতা বাসকালে শিবনাথ যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণ সান্নিধ্যে থেকেছেন, সেখানেই চরম অনাচার এবং অসংযম দেখেছেন। এমনকি মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসায় থাকার সময়ও দেখেছেন। সপ্তাহান্তে মামা যখন বাড়ি

চলে যেতেন তখন বাসার ব্রাহ্মণদের আচার-আচরণ মাত্রা ছাড়া হত। যা নিষ্ঠাহীন তথাকথিত ছোটো জাতদের চেয়েও জঘন্য। যদিও এই জঘন্যতাকে শিবনাথ তার আত্মজীবনীতে অকপটে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মন্তব্য করেন নি। নিজে শিবের মতোই সব কিছু সহ্য করেছেন। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাসার সহবাসী ব্রাহ্মণরা এমন ঘটনা ঘটাত যে অনেকদিনই বালক শিবনাথকে সবার জন্য রান্না করতে হয়েছে। এই সময়ে মামার প্রেসের এক সম্পর্কের মামা মদ খেয়ে সুকিয়া স্ট্রিটের গণিকালয়ে মাতালামো করলে যে অপমান ও গণিকারা। নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করে, তার হাত থেকে বাসার সম্মান রক্ষা করার জন্য। শিবনাথ বাসার চাকর যেদোকে সঙ্গে নিয়ে সেই গণিকালয়ে যায় এবং সেই মাতালকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। গণিকারা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসার লোক বলিয়া। তাহার নাম উল্লেখ করিয়া গালি দিতেছে। বারাঙ্গনার মুখে মাতুলের নাম, ইহা যেন আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমি মামাকে ধরিয়া আনিবার জন্য বাসার বয়াে্জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাহারা নেশা করিয়া বুদ হইয়া ছিলেন, কেহই আমার কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না।সম্ভবত এই অনাচারের পাশাপাশি সমকালে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের আচার-আচরণ তার কাছে জীবনের অনেক বেশি গ্রহণীয় আদর্শ মনে হয়েছে শিবনাথের। সেজন্যই তিনি ছাত্র বয়সেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন ৭ই ভাদ্র ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতায় বসবাসকালে বিভিন্ন বাসা পরিবর্তন করে, নানারকম কষ্ট ভোগ করে শেষ পর্যন্ত তাঁর বাবা তাকে ভবানীপুরের মহেশচন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে রেখে যান। যিনি চরিত্রগুণে সাধু এবং সদাশয় হাইকোর্টের উকিল। এখানে সমবয়সী কয়েকজন ছাত্রকে পেয়ে শিবনাথের লেখাপড়া ভালো চলতে লাগল। অন্তত আগেকার বাসাগুলির মতো একহাতে ভাতের কাঠি, এক হাতে বই করে কাটাতে হয়নি। এখানেই বাসার নিকটে ব্রাহ্মসমাজ গৃহ হওয়াতে মাঝে মাঝে ব্রাহ্মসমাজে এসে বক্তৃতাদি শুনতে লাগলেন। এখানেই কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর বক্তৃতা শোনেন। ক্রমে নিজের গ্রামের ব্রাহ্ম শিবকৃষ্ণ দত্ত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উমেশচন্দ্র দত্ত, কাশীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু প্রমুখর ব্রাহ্ম আন্দোলন তাকে প্রভাবিত করে। এরই

মধ্যে ১৮৬৪ সালের এক ভয়ানক ঝড়ের অভিজ্ঞতা ও এক রাত্রির বাইরে যাপন তার ভাবান্তর ঘটিয়ে থাকবে। ব্রাহ্মণ সন্তান হিসেবে প্রথম। আমাণের রান্না খাবার অভিজ্ঞতায় লিখেছেন- ছাত্রাবস্থায় ভবানীপুরে থাকার সময় উমেশ ও যোগেন্দ্রর সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত—এঁদের বাসাতে অন্য জাতীয় মহিলার হাতের রাধা ভাত মাটিতে সানকে খাইয়া সমস্ত রাত্রি গা ঘনঘন করে।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সুধ্যায়ে একদিকে যেমন বিদ্যাসাগর অনুগামী হতে পেরেছেন। তেমনই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য আর একটি মহৎ মানবহিতৈষী উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছেন; তা হল বিধবা বিবাহ। শিবনাথ ১৮৬৮ সালে প্রথম বিধবা বিবাহ দেন বিদ্যাসাগরের সহায়তায় নিজের জ্ঞাতি দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (যিনি পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন)-র কাছ থেকে ঈশানচন্দ্র রায়ের বিধবা বোন মহালক্ষ্মীর সম্পর্কে জেনে নিজের বন্ধু বিপত্নীক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে দেন। হেমচন্দ্র বিধবা মহালক্ষ্মীকে পড়াতেন, সেই সূত্রে মেয়েটির সম্পর্কে জানেন। মহালক্ষ্মীর তখন ১৮ বছর বয়স। এই বিয়ের সমস্ত ব্যয় বিদ্যাসাগর বহন করল। কন্যাকে কিছু গহনাও দেন। এই বিবাহের ফলে যোগেন্দ্রর আত্মীয়-স্বজন তাকে একঘরে করেন। ফলে তাদের সম্পূর্ণ নির্বান্ধব অবস্থায় সংস্কার নির্বাহের জন্য ঈশান, যোগেশ এবং শিবনাথের নিজের স্কলারশিপের টাকায় শিবনাথ যোগেশ ও মহালক্ষ্মীর। সঙ্গে বসবাস করে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। এ রকম আরও অনেক বিধবা বিবাহ দিয়েছেন শিবনাথ, এরকম আরও অনেক পরিবারের ব্যয়ভার নির্বাহ করেছেন। বন্ধুর প্রতি কর্তব্যবোধ, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদের জন্য। এবং অনেক বিধবা মহিলা ও সহায়হীন নারীর প্রতি ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা শিবনাথের। কতখানি গভীর ছিল তা তার আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় বিধৃত।

শিবনাথ শাস্ত্রী শুধু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন নি, এর জন্য তিনি পিতা কর্তৃক চিরকালের মতো পরিত্যক্ত হয়েছেন। সেই ছাত্রাবস্থাতেই। কেবল মামা দ্বারকানাথ এ বিষয়ে তার সাল থেকেছেন। শিবনাথ যখন ব্রাহ্ম হন তখন উন্নতিশীল ব্রাহ্ম সমাজ ও আদি

ব্রাহ্মসমাজ-এ রকম দুটি ভাগ ছিল। যদিও শিবনাথ আদি সমাজের অনুগামী ছিলেন। তবু অচিরেই তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় কেশব সেন নগর কীর্তন করে কলকাতা মাতিয়ে তুলেছেন। তার একটি নগর কীর্তনের কাগজে লেখা ছিল ।

তোরা আয়রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান

নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,

যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত-বিচার।

‘এই ধ্বনি আমার প্রাণে বাজিল, আমার যেন মনে হইল আমাকে ডাকিতেছে। ইহাতে ব্রাহ্মধর্মের যে আদর্শ আমার নিকট ধরিল, তাহাতে আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। সেদিন কেশববাবু Regenerating Faith বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এরূপ উপদেশ আমি অল্পই শুনিয়াছি। ধর্ম বিশ্বাস যদি নবজীবন আনিয়া না দেয় তবে তাহা ধর্ম বিশ্বাস নয়, এই সত্য আমার সমক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য একটা নূতন দ্বার যেন খুলিয়া দিল।’ দীক্ষার কয়েক মাস পরেই শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবের উপাসনাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অযোধ্যাধানাথ পাকড়াশী মহাশয়ের সঙ্গে একই বেদীতে বসে তিনি উপদেশ দিলেন। এর পরই সিন্দুরিয়াপটী পারিবারিক সমাজের আচার্যের ভার গ্রহণ করলেন। ছাত্রাবস্থায় শিবনাথ শাস্ত্রী কবি ও কবিতা বিশেষজ্ঞ হয়ে ঠেন। বাল্যে ছন্দ মিলিয়ে কবিতা পড়ার কালেই ছন্দে কবিতা লিখতে শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সোমপ্রকাশ, এডুকেশান গ্যাজেট প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লেখেন। এরকম কবিতা তিনি অনেক সময় অন্যের কবিতার উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছেন। সোমপ্রকাশে মধুসূদনের এম, এস, ডট- এর অনুকরণে শিবনাথ নিজের নাম লিখেন শ্রী শিঃ। প্রতিযোগী কবি বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করলে কবিতায় তার উত্তর দিলেন -

বিদ্যার সাগর তব মুর্খের প্রধান,

টীকিদার ভট্টাচার্য্য নাহি কোন জ্ঞান।

ধবলাঙ্গী তাকেশী বিড়াল-লোচনা,

বিবাহ করিবে সুখে ইংরেজ ললনা।

আধ্যাত্মিক ভাবের একটি কবিতা -

নিজ দলে গেলে পরে সমাদর পাই হে,

আপনারে বড় ভাবি তাই হে।

কিন্তু কি যে বড় আমি।

জান তুমি অন্তর্যামী।

তব অগোচরে প্রভু কোন কথা নাই হে। সে যুগে তিনি নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তার প্রকাশিত একটি কাব্যগ্রন্থ হল 'নির্বাসিতের বিলাপ'—১৮৬৮, এ ছাড়াও একাধিক কাব্য লিখেছেন। শিবনাথ যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই ব্রাহ্মসমাজ ও উপাসনা ধ্যানকে নিয়ে চলেন। ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদের সঙ্গে তার এমন এক ধরনের গভীর সম্পর্ক ছিল, যা সবকালেই দুলর্ভ। বন্ধুরাও তাকে অদ্ভুত বিশ্বাস করতেন। শিবনাথ যখন যোগেন-মহালক্ষ্মী, ঈশ্বনদের সঙ্গে বাস করতেন, সেই সময়কে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল বলেছেন। 'এই কালের মধ্যে আমার অন্তরে ধর্মভাব ও ব্যাকুলতা পূর্ণমাত্রাতে কাজ করিতেছিল, অপরদিকে বন্ধুদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা পূর্ণমাত্রাতে ভোগ করিতেছিলাম।' এই সময় একরাত ঈশানচন্দ্র সেন লক্ষৌ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতেন। কলকাতায় এসে অবস্থান কালে শিবনাথকে নিজের বাসায় রাখলেন। রাত্রে শোবার সময় নিজে একটি খাটে শুয়ে অন্য একটি খাটে শিবনাথের শয়নের ব্যবস্থা করে। রাত্রে স্ত্রী এলে তাকে বললেন, "আমার। কাছে আজ তোমার শুইয়া কাজ নাই, তুমি শিবনাথের কাছে গিয়া শোও; ও তোমাকে কিছু কথা বলিবে। আমি ঘুমাই, তুমি কথা শোন।" বলে তিনি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে গেলেন। শিবনাথ অনেক সময় তার স্ত্রীর সঙ্গে তাদের দাম্পত্য বিবাদ নিয়ে কথাবার্তা বললে, তারপর তিনি ছেলেদের কাছে ঘুমাতে গেলেন। শিবনাথও নিদ্রা গেলেন। শিবনাথ এই

প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বন্ধুদের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির বিষয় যখন স্মরণ করি, তখন ধন্যবাদ করি। কারণ ইহাদের সদ্ভাব ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়মনের অনেক উপকার হইয়াছিল।"

এরকম তখন তিনি অনেক মানুষের দাম্পত্য জীবনের সুহৃদ হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের স্ত্রীকেও তিনি পড়িয়েছেন। অনেক বিষয়ে তারা শিবনাথের ওপর নির্ভর করতেন। বিদ্যাসাগরের পরামর্শ ও সঙ্গদান, মামা দ্বারকানাথের সোমপ্রকাশের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। একজন পাদরীও তার বন্ধুত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে তার হৃদ্যতা ও কথোপকথনের কথা সাধারণে বিশেষ অবগত নন।

আত্মচরিতে সেই প্রসঙ্গে লিখেছেন, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য যিনি ভবানীপুরের, তার শশুরবাড়ি দক্ষিণেশ্বরে। তিনি শিবনাথকে রামকৃষ্ণ দেব সম্পর্কে বলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দিরে এক পূজারি ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি সাধনের জন্য অনেক স্বীকার করেছেন। কেশবচন্দ্র সেনও তার সঙ্গে কথা বলে প্রীত ও চমৎকৃত হয়েছেন। শুনে তিনি বন্ধুটিকে নিয়ে একদিন গেলেন।

"প্রথম দর্শনের দিন হইতেই আমার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ ভালোবাসার লক্ষণ দৃষ্ট হইল। আমিও তাহাকে দেখিয়া বিশেষ চমৎকৃত হইলাম। আর কোনও মানুষ ধর্মসাধনের জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কি না জানি না। রামকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন যে, তিনি কালীর মন্দিরে পূজারি ছিলেন। সেখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিতেন। ধর্মসাধনার্থ তাহার যিনি যাহা বলিতেন সমুদয় তিনি করিয়া দেখিয়াছেন। এমনকি এইরূপ সাধন করিতে করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন। কিছুদিন উন্মাদ-গ্রস্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাহার পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেন। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। এমনকি অনেক দিন পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার আলিঙ্গনের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া গিয়াছেন।"

রামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে এসেই শিবনাথ শাস্ত্রী ধর্মের একতা ও রূপের ভিন্নতা সম্পর্কে, ধর্মের উদারতা ও বিশ্বজনীনতা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলেন। একবার তার সেই ভবানীপুরের

খ্রিস্টীয় পাদরী বন্ধুকে নিয়ে রামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন, "মশাই এই আমার একটি খ্রিস্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন।" অমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইয়া মাটিতে মাথা দিয়া বলিলেন, "যীশু খ্রীষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।" আমার খ্রিস্টীয় বন্ধুটি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায় যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাকে আপনি কী মনে করেন?"

উত্তর—কেন, ঈশ্বরের অবতার।

খ্রিস্টীয় বন্ধুটি বলিলেন—ঈশ্বরের অবতার কীরূপ? কৃষ্ণাদির মতো?

রামকৃষ্ণ—হাঁ সেইরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, যীশুর এক অবতার।

খ্রিস্টীয় বন্ধু—আপনি অবতার বলতে কী বোঝেন?

রামকৃষ্ণ-সে কেমন তা জান? আমি শুনেছি কোনো কোনো স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোনো বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মতো হল। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ। অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন; কোনো বিশেষ কারণে কোনও এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী। শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মত হলো। যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যে কিছু শক্তি সে ঐশী শক্তি, সুতরাং তারা ভগবানের অবতার।' রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশে শিবনাথ এভাবেই ধর্মের সার্বভৌমিকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এরপর উভয়ের মধ্যে এমন মিত্রতা হয় যে রামকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে শিবনাথকে দেখবার জন্য তার বাড়িতে ছুটে গিয়েছেন।

আত্মচরিতের এরকম আর এক উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার আলোচনা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে হয়। বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে শিবনাথ যোগাযোগ করেছেন, যুক্ত থেকেছেন। বিদ্যাসাগর মশাই নানা কারণে তাকে সাহায করেছেন। একবার ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ব্রাহ্ম উপাসনা মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যান। তখন সেখানে মহর্ষির কাছে রাজনারায়ণ বসু উপস্থিত ছিলেন। রাজনারায়ণ-

শিবনাথ ও মহর্ষির মিলনে যেন মণি-কাঞ্চনের যোগ। মহর্ষির হৃদয় দ্বার খুলে প্রেমের উৎস, আনন্দের উৎস উৎসারিত হতে লাগল। তিন জনের অট্টহাসে অতবড় বাড়ি মুখরিত হতে লাগল। 'ক্রমে নির্ঝরের সুস্নিগ্ধ বারির ন্যায় মহর্ষির বাক্যস্রোতে হাফেজ আসিলেন: নানক আসিলেন; মঞ্চষিরা আসিলেন; উপনিষদ আসিলেন; আমরা সকলে সেই রসে মগ্ন হইয়া গেলাম।' বাকস্রোতে মহর্ষির কান দুটো লাল হয়ে উঠল। তার মস্তকের কেশ খাড়া হয়ে উঠল। আর তার বাক্যালাপে অদ্ভুত মিষ্টতা ও হাস্যরস ছিল। উঠবার সময় দক্ষিণের বারান্দায় কোণের এক ঘরে নিয়ে গিয়ে বিবিধ মিস্টান্ন পূর্ণ পাত্রের পাশে বসিয়ে নিজ হাতে শিবনাথকে সে সব খাওয়াতে শুরু করলেন। আবদার করে করে। অনেক খাওয়ালেন। মহর্ষির সম্পর্কে শিবনাথ আরও লিখেছেন, "এমন সুন্দর, এমন পবিত্র, এমন অকপট হাস্য মানুষ কম দেখিয়াছি। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের মধ্যে অকপট অট্টহাস্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু মহরি হাস্য বড়ো কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। তবে তিনি সকলের কাছে হাসিতেন না। নিতান্ত অনুরক্ত লোকের ভাগ্যেই তাহা ঘটিত। আহারান্তে তিনি শিবনাথকে আবার বসার ঘরে এনে সাত হাজার টাকার চেক দিলেন। যদিও তিনি দুই হাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে ধর্মপ্রচার কালে এরকম আর একটি উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকারের বিষয়ে লিখেছেন। বোম্বাই বসবাস কালে থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ম্যাডাম ব্লাভাটস্কী ও তার সহকারী বন্ধু কর্ণেল অলকটের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ব্লটিস্কীরা তাকে খ্রিস্টান করার অনেক চেষ্টা করেন। এই সময় শিবনাথের সঙ্গী হয়েছিলেন পাঞ্জাবি যুবক লাল সিং। মাদাম ব্লাভাটীর সঙ্গিনী এক মেম লাল সিং-এর চুল আঁচড়ে, পরিষ্কার করে বেঁধে দিতেন। এত সেবা, সঙ্গ দানেও তারা শিবনাথ ও তাঁর সঙ্গীকে খ্রিস্টান করতে পারেন নি। ফিরবার সময় ব্লাভাটী বলেন, 'তোমাদিগকে এত বোঝানো বৃথা হইল।'

১৮৭৩-৭৪-এ স্বাস্থ্যের কারণে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কাশীতে বাস করতে শুরু করলে শিবনাথ হরিনাভি হাইস্কুলের হেড মাস্টার হয়ে এবং সোমপ্রকাশের দায়িত্বভার নিয়ে একত্রে উভয়ের কাজ শুরু করতে লাগলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কাজও জোর কদমে।

চালালেন। একই সঙ্গে এই হরিনাভি সংলগ্ন গ্রামগুলির সর্ববিধ কল্যাণেও আত্মনিয়াোগ করেন। হরিনাভি, রাজপুর, চাংড়িপোতা প্রভৃতি বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির গ্রামগুলির উন্নতির বিষয়ে লক্ষ দেন। হরিনাভি হাইস্কুল ও হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজও সংস্কার করলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে উৎসব করলেন। ১৮৭৪-এ শিবনাথ-এর ম্যালেরিয়া হলে কলকাতার সাউথ সুবার্বন স্কুলে হেড মাস্টার হয়ে আসেন। ১৮৭৬-এ আবার হেয়ার স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক হয়ে যোগদান করেন। এই সময়ে তিনি একত্রে সিন্দুরিয়াপটীর ব্রাহ্মসমাজের আচার্যর দায় হরিনাভিতে ‘সোমপ্রকাশের নিয়মিত প্রকাশ এবং ব্রাহ্মসমাজের দেখভাল, আর ভবানীপুরের শিক্ষকতা সবই করেছেন। গরে আবার নিজের কাজের সুবিধার জন্য সোমপ্রকাশ কাগজ এবং ছাপাখানা ভবানীপুরে নিয়ে আসেন। শিবনাথ যেমন ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হলেন তেমনই মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা ও হিন্দু মহিমা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও এগিয়ে আসেন, এটিই পরবর্তীকালের বঙ্গ-মহিলা-বিদ্যালয়। নিজের মেয়ে হেমলতাকে এই স্কুলেই ভর্তি করেন। এ ছাড়াও শিবনাথের স্ত্রী প্রসন্নময়ী ও দ্বিতীয় স্ত্রী বিরাজসুন্দরী দেবীও বাড়িতে কয়েকটি অনাথ মেয়ের লালন-পালন করতেন। এমনকি তৎকালের সমাজের বেশ্যাদের মেয়েরাও শিবনাথের আশ্রয়ে পালিতা হয়েছে, লক্ষ্মীমণিরা যেরকম।

শিবনাথের এই সর্বাতিশায়ী ব্রাহ্ম ধর্মোপাসনার কালেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়েই ব্রাহ্মসমাজের ভয়ঙ্কর বিরোধ দেখা দিল। নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্বে কেশবচন্দ্র কখনও ‘মিরর’ পত্রিকায় আর্টিকেল লিখে এই বিরোধের শুরু করেছেন, কখনও বক্তৃতা করে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় বিরাোধ শুরু হল কেশবচন্দ্রের মেয়ের সঙ্গে কোচবিহার রাজার বিবাহকে কেন্দ্র করে। কোচবিহার রাজের সঙ্গে তার মেয়ের বিবাহকে কেন্দ্র করে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তিত সমস্ত নিয়ম ভেঙেছেন। ব্রাহ্মদের মিলিত আবেদনও গ্রাহ্য করেন নি। ১৮৭৮ সালের মার্চে কেশববাবুর নাবালিকা কন্যার কোচবিহার রাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা অগ্নি জ্বেলে হোম করে বিয়ে হল।

শিবনাথদের সবরকম ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিপ্রতীপে কেশববাবুর এই কোচবিহার-বিবাহ প্রসঙ্গ এক বড়ো আঘাত। এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী ও এতখানি নরমপন্থী ছিলেন যে কোনো কঠোর অবস্থান নিতে পারেন নি বা প্রতিবাদ করতেন পারেন নি। অথচ অসংখ্য জনহিতকর কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত থেকেছেন। আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যেমন, এই বর্মীয় আন্দোলনের জন্যই তিনি শেষপর্যন্ত ১৮৭৮-এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে সমগ্র ভারত ঘুরে ব্রাহ্মধর্মে প্রচারে অগ্রসর হন। আবার রাজনৈতিক কার্যক্রমেও তিনি যুক্ত থেকেছেন। আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মতোই ভারতসভা গঠন করেন। এ বিষয়ে শিশিরকুমার ঘোষও তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আসেন। সব বিষয়ে শিবনাথ যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে ছুটেন তেমন এবারও তাকে ভারতসভার সভাপতি করার জন্য। কিন্তু পর কারণে অসম্মত হন। তবে উদ্যোক্তাদের মধ্যে অমৃতবাজার দলের নাম শুনে বিদ্যাসাগর বলে উঠেন, "যাঃ তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতর নিলে কেন?" বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে কতখানি দূরদর্শী ছিলেন, তার প্রমাণ দু-তিন দিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। শিশির কুমার ঘোষ ভারতসভার সম্পাদকের পদ না পেয়ে, সুপ্রসিদ্ধ খ্রিস্টীয় আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে 'ইন্ডিয়ান লীগ' স্থাপন করে নিজে তার সম্পাদক হয়ে বসলেন। তবু ৯৩ নং কলেজ স্ট্রিটের একটি ঘর ভাড়া করে ভারতসভা' গঠিত হয়। এই ভারতসভা কক্ষ থেকে অনেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ওদিকে অল্পদিনের মধ্যেই 'ইন্ডিয়ান লীগ' উঠে গেল।

কোচবিহার-বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মদের মধ্যে কেশববাবুকে নিয়ে যে বিরাোধের সূত্রপাত হয়, তারই পরিণতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। এই সমাজ প্রতিষ্ঠার দুটি প্রধান কারণ; ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশববাবুর একনায়কত্ব, দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মগণের এবং ব্রাহ্মসমাজ সকলের প্রতি যে উপেক্ষা দেখিয়েছেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তা হবে না। এখানে সকলের সমানাধিকার থাকবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথদের সমাজের নাম ছিল আদি সমাজ তারা কালে আছেন, কেশববাবুর সমাজর নাম ভারতবর্ষীয় সমাজ—তিনি দেশে

আছেন, আর তোমরা দেশ কালের অতীত হইয়া যাও—এই কথা বলেছিলেন মহর্ষি। শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে একটি মুখপত্রও প্রকাশ করতে লাগলেন—তত্ত্ব কৌমুদী' নামে। আদি সমাজের পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী', ভারতবর্ষীয় সমাজের পত্রিকা 'ধর্মতত্ত্ব' এ সময় শিবনাথ তত্ত্বকৌমুদী ছাড়াও ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'-এর সম্পাদনাও করতেন। এ ছাড়া সমালোচনা নামেও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। শিবনাথ তত্ত্বকৌমুদী নামটি ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাক্ত দুটি পত্রিকা। থেকে "তত্ত্ব" এবং রামমোহন রায় থেকে কৌমুদী নামটি নিয়ে একত্রে এই নামকরণ করেন। এ সময় চাকরি ছেড়ে শিবনাথ দিনরাত—রাত্রে অধিক সময় জেনে, কখনও ১টা-২টা পর্যন্ত সমাজের যাবতীয় কাজ করেছেন। আনন্দমোহন বসু সাধারণ সমাজের সভাপতি হয়েছিলেন। তাই তার পরামর্শ নিয়মিত নিয়েছেন শিবনাথ।

সাধারণ সমাজ প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক রূপে বের হলেন। প্রথমে বিহার ও উত্তর পশ্চিম দিকে গেলেন। কঠিন সেই যাত্রা। উত্তর-বিহার ও নেপালের পথে ৫০ মাইল কষ্টকর এক্কা গাড়িতে চড়ে। মতিহার থেকে ফিরে বাঁকিপুর, আরা, এলাহাবাদ হয়ে লক্ষ্ণৌ। আবার কলকাতায় ফিরে তত্ত্ব কৌমুদীর কাজ, আচার্যের কাজ। এই সময়ই ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে নূতন মন্দিরের জন্য জমি ক্রয় করে উদ্যোগ শুরু হয়। এই মন্দিরের সঙ্গে সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা হল। ফলে আর একবার শিবনাথকে বাইরে থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেখভালের দায়িত্ব নিতে হল। হরিনাভির হেড মাস্টার থাকাকালে যে কাজ তিনি করেছিলেন। আজ সিটি স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সে রকম কাজই আবার করতে হল। এই পর্যায়ে ব্রাহ্মসমাজের ছাত্র সংগঠন ছাত্রসমাজ গড়লেন সিটি স্কুলেই। কলকাতার এ সব কাজে কিছুটা স্থিতি হলে, নিজের দুই স্ত্রী ও সন্তানদের কলকাতায় রেখে আবার প্রচার কার্যে উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, ও মাদ্রাজ হয়ে সমগ্র প্রচারে বেরিয়ে পড়লেন। সে সময় আর্থিক সঞ্চয় অথবা সংস্থানের কথা একবারও না ভেবে, সবটাই সশারের ওপর ছেড়ে পথে নেমে পড়েছেন বারবারই। কখনও ভিক্ষা লব্ধ অথে, কখনও সম্পূর্ণ অস্কাচিত ও অপ্রত্যাশিত দানের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু প্রচার কার্য কোথাও ব্যহত হয় নি। তবে দক্ষিণ ভারতে

বিশেষজ্ঞ মাদ্রাজ প্রভতি অঞ্চলে জাতপাতের কঠিন নিয়মের পরিচয় পেয়েছেন তিনি। এই সময় হায়দ্রাবাদে বসবাস কালে নবলরাও সৌকিরাম আদভানি নামে এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর সম্পর্কে ব্রাহ্ম হিসেবে তার সমাজ নিষ্ঠার কথা শিবরাম উল্লেখ করেছেন। বোম্বাইয়ের বি.এম. ওয়াগলে, নারায়ণ পরমানন্দ, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, মহাদেৱ গোবিন্দ রাণাডে, মিস্টার কুণ্টে, তেলাঙ্গ প্রভৃতি মহাত্মাদের সঙ্গে পরিচিত হন। এখানে রাণাডের সঙ্গে পরিচয় কালে গভর্নমেন্টের উচ্চশ্রেণির কর্মচারীর সাধারণ সাদাসিধা ব্যবহার শিবনাথ উল্লেখ করেন; তাহার পায়ে একটা সামান্য বেনিয়ান, মাথায় একটা নাইট ক্যাপ, যেরূপ ক্যাপ আমরা কলকাতায় রাজপথের সামান্য লোককে পরিতে দেখিয়াছি। শিক্ষিত বাঙালি পদস্থ লোক এবং বোম্বাই-এর পদস্থ লোকের এত প্রভেদ। দক্ষিণ ভারতের প্রচার শেষ করে কলকাতায় ফিরে আবার পাহাড়ে দার্জিলিং-এ ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠায় বললেন। এখান থেকে ফিরে জাহাজ যোগে মাদ্রাজ যান। এই মাদ্রাজেই জাতিভেদ প্রথার তীব্রতার মুখোমুখি হতে হয়। রাজমাহেন্দ্রীর কামটী জাতির রামকৃষিয়া নামক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকার কালে ভয়ঙ্কর জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে পরিচিত হন। কলকাতায় ফিরে এলে ১৮৮১-র ১০ মাঘ মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। তারপরই অমৃতলাল বসুর নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ প্রকাশ্যে এল। এই সময় শিবনাথ Dispensation and Sadharam Brahmo Samaj নামে ইংরেজি বই লেখেন। এবার আবার তিনি কোয়েম্বাটুর যান। সেখানে জাতপাত সমস্যা এত তীব্র যে, তার চাপে খ্রিস্টানরাও পৈতাধারী হয়েছেন। এরকম খ্রিস্টানও তিনি দেখেছেন। এবার প্রত্যাবর্তনের পর আবার Indian Messenger নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই উপলক্ষে সমাজের নিজস্ব একটি প্রেস নানা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে টাকা ধার করে প্রথমে। নিজের নামে প্রেসটি কেনেন, পরে তা সমাজকে দেন।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন স্বর্গ গমন করেন। শেষ জীবনে তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে সিমলা যান। শারীরিক নানা কষ্ট নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই যে কলকাতা মহানগরীতে এত বড় ব্রাহ্ম বিপ্লব, এত দিল, নানারকম পুস্তক, সংবাদ-

সাময়িকী, স্কুল প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা-উপসনার বিপ্লব। সমগ্র ভারত তথা বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে ধর্ম প্রচার: তবু বাংলার গ্রাম দেশে ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে কী রকম ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল তার প্রমাণ তারা যখন বর্ধমানের বড়বেলুন গ্রামে হন প্রচার করতে যান। জমিদার ও সাধারণ মানুষেরা সমস্ত রকম যোগাযোগ বন্ধ করে দোকানের জিনিসপত্র বেচা-কেনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, এমনকি শিবনাথবাবুরা যখন নগর কীর্তনে বেরুলেন, তখন সমস্ত পথ জনহীন করে, গৃহদ্বার রুদ্ধ করে রেখেছিলেন মানুষেরা।

১৮৮৭-তে দীর্ঘ কয়েক বছর পর শিবনাথ কাশীতে গিয়ে অসুস্থ বাবার মুখোমুখি হন। শেষ পর্যন্ত বাবা প্রিয়তমা পুত্রের সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন। ব্রাহ্ম শিবনাথ শাস্ত্রী সঙ্গে ব্রাহ্মণ হরচন্দ্র ভট্টাচার্যর সংলাপটি বড়ই মর্মস্পর্শী।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে শিবনাথ দুর্গামোহন দাস ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু পার্বতীচরণ রায়ের সঙ্গে ইংলন্ডে যান। সেখানকার ইংরেজদের সত্যানুবাদিতা ও কর্ম নিষ্ঠা, ইংরেজ মহিলাদের চারিত্রিক সততা বিষয়ে চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত ইংরাজ পরিবারের, শিক্ষা, কর্মকুশলতা, সততা ও সংগ্রামশীল জীবনের সঙ্গে বাঙালি সমাজের বৈপরীত্যের দিকটি শিবনাথ বার বার নির্দেশ করেছেন। উনবিংশ শতকের রেনেসা পুরুষ হিসেবে শিবনাথের আত্মচরিত বাংলা, ভারত ও ইংলেন্ডীয় জীবনের যে পর্যালোচনা তুলে ধরেছে, তা বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সহজ সরল গদ্য ভাষায় শিবনাথের বর্ণনার মধ্যে এমন এক আকর্ষণীয় টান আছে, যা ক্লান্তিহীন পাঠে সামনে এগিয়ে চলতে সহায়তা করে।

শিবনাথ ছ'মাস ইংলন্ডে ছিলেন। এখানে তার প্রধান ঔৎসুক্য ছিল এত অল্প সংখ্যক লোক হয়েও কীভাবে তারা এত বিপুল দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করল। তিনি দেখেছেন একদিকে যেমন তাদের স্বাতন্ত্র-প্রবৃত্তি ও স্বাবলম্বন শক্তি আছে, অপর দিকে তেমনই সাধুভক্তি ও সততা আছে। সমগ্র দেশের মানুষ সরকারের দিকে লক্ষ না রেখে, সরকারের প্রতি নির্ভরতার অপেক্ষা নিজেদের প্রচেষ্টা এবং সম্মিলিত প্রয়াসের ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। আর দেখেছেন নারী শক্তির অপূর্ব সূরণ এবং তাদের

শিক্ষা। ইংলন্ডে গিয়ে যেসব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন প্রফেসর ও সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ই. বি. কাউয়েল। তার মতো সাধু পুরুষের সংশ্রবে এসে কয়েকজন ছাত্র খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা। নিয়েছিলেন। তিনি শিবনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এখন তিনি পলিতকেশ, স্থবির, তার শুভ্র শাজাল নাভিকে অতিক্রম করেছে। চোখ-মুখে গভীর জ্ঞানানুরাগ ও সাধুতার দেদীপ্যমান প্রমাণ। সিপাহি বিদ্রোহের হাঙ্গামা থামলে, নববর্ষের পারিতোষিক বিতরণের সময় তিনি যে সংস্কৃত কবিতাটি লিখেছিলেন, শিবনাথ শাস্ত্রী স্মৃতি থেকে তা তার শুরুণে শোনালেন।

বিদ্যালয়: স্বালয়মেত্য সাম্প্রতম।

সমৃদ্ধ-কীর্তির্ভবনে ভবিষ্যতি।

তথাহি সানো মলাস্যনানতঃ

ধ্রুবং সমারোহতি চন্দনদ্রুমঃ।

অর্থাৎ এলে আপনার বাড়িতে এসে উন্নতি লাভ করে জগতে বিখ্যাত হবে। তা ত হবেই, কারণ মল পতে সানুদেশেই, চন্দনগাছ বেড়ে থাকে।

এই শুনে তিনি শিক্ষা ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলেন। শিবনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

উনিটেরিয়ানদের নেতা ও গুরু জেমস মার্টিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার কাছ কেন জানলেন, কেবলমাত্র ভ্রম ও কুসংস্কারের প্রতিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতার উপরে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে বিপদ আছে। ধর্মভাবাপন্ন ভক্তি প্রধান ব্যক্তিদিগকে সেরকম সমাজে তৃপ্ত রাখা যায় না। তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পার্থক্য মাত্র দুটি কথায়, এলছিলেন শিবনাথকে সিড়ি থেকে বিদায় জানাতে গিয়ে, ‘Give us a little of your mysticism and take from us a little of our practical genius.’ প্রাচ্যের ভক্তিপ্রবণতা ও প্রতীচ্য কর্মশীলতা মিলিত হয়ে যে আদর্শ কর্ম জীবন গঠিত হয়। তাই ব্যক্ত করলেন। এরকম মিস কল, ফ্রান্সিস নিউম্যান, থীস্টিক

চার্চের আচার্য রেভারেণ্ড চার্লস ভয়সী, উইলিয়ম স্টেড সাহেব, অধ্যাপক মলিয়ার উইলিয়মস, জন এস্টলিন কার্পেন্টার, রেভারেণ্ড টপফোর্ড ব্লক, মিসেস ফাসেট, মিসেস জোসেফাইন বাটলার প্রমুখর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

শিবনাথ ছ'মাস ইংলন্ড বাস কালে শেষ দু'মাস মিস কলেটের নির্দেশে টুবনার কোম্পানির জন্য ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ইংরেজিতে লিখছিলেন। কিন্তু পরে টুবনার বইটি ছাপাতে অনিচ্ছুক হলে রেভারেণ্ড উপফোর্ড ব্রুক লেখা শুনে ম্যাকমিলনকে ছাপাতে বলবেন বলে শিবনাথকে থাকতে বলেন ইংলণ্ডে, কিন্তু শিবনাথ দেশে ফিরে বাকি অংশ লেখা সম্পূর্ণ করে এদেশে প্রকাশ করেন।

ইংলন্ডে অবস্থানকালে শিবনাথ রাজা রামমাোহন রায়ের সমাধিস্থলে ব্রিষ্টলে তার মৃত্যু বার্ষিকী পালন করেন। এবং বিস্মিত হয়ে দেখেন এখনও সে দেশের কিন্তু মানুষ রামমোহন রায়কে মনে রেখেছেন। যে ডাক্তার শেষ পর্যন্ত রামমোহনকে দেখেছিলেন, তার কন্যা তখনও জীবিত ছিলেন, তিনি শিবনাথের সঙ্গে দেখা করে রামমোহনের একটি মাটির মূর্তি ও তার মাথার শালের পাগড়ি স্মৃতি চিহ্ন দুটি স্বযত্নে রেখেছিলেন, তা শিবনাথের হাতে তুলে দেন। এদেশে এনে সেগুলি শিবনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হাতে তুলে দেন।

ব্রিষ্টল নগরীতে অনাথ আশ্রম বাটিকা নির্মাণ করেছেন যিনি, সেই মহান জর্জ মুলারের সঙ্গে ফিরবার পথে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোয় সাক্ষাৎ হয়। ইতিপুবেই শিবনাথ তার “The Lord's Dealings with George Muller.' গ্রন্থটি পড়েছিলেন। এখন মুখোমুখি সাক্ষাৎ হতে জানলেন, এই সাধুপুরুষ সব বিষয়েই প্রার্থনা করেন, এমনকি একটি, চাবি হারিয়ে গেলেও তিনি ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করেন।প্রত্যেক ইংরাজ গৃহে একটি Drawing Room রয়েছে। সেখানে কেউ শয়ন করে না। কেমন অতিথি অভ্যাগত এলে সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। বাড়ির লোকে আহারের পর বিশ্রাম করে, গল্প করে। আর একটি কক্ষ তা study বা পাঠাগার। এই নির্জনতা বাস বা আত্মচিন্তার ফল তাদের কর্মকুশলতা সপ্তাহের একটি দিন বা ছুটির দিন হাজার হাজার লোক

শহরের বাইরে গিয়ে আরাম বা আমোদে কাটায়। আমোদ ও হুল্লোড় প্রাণের স্মৃতি আনে।

শিবনাথ তার ইংলেন্ড স্মৃতি প্রসঙ্গে লিখেছেন, মধ্যবিত্ত ভদ্র ইংরাজ গৃহস্থের ভবনে নারীর অধিকার। ইংরাজের গৃহে, গৃহিণী সত্য-সত্যই গৃহস্বামিনী, রাণী ।...পুরুষ যাহা উপার্জন করেন তাহা গৃহিণীর হস্তে দিয়া তাঁহারই কর্তৃত্বাধীন হইতে ভালোবাসেন। নারীজাতির শিক্ষা ও সামাজিক অধিকারের পর ইংরাজ গৃহস্থের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ পারিবারিক সব কাজের সুব্যবস্থা। প্রতিটি কাজ ঠিক সময়ে হয়। নিয়মানুবর্তিতা। এই জাতিকে এত বড় করেছে।

দেশে ফিরে শিবনাথ ইন্দোর এবং পুনরায় মাদ্রাজ প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে যান। রানাডের সঙ্গে আবার বাম্বোই প্রেসিডেন্সিতে সাক্ষাৎ হয়। এরপর কালিকট বন্দরে যান। এখানে নারী সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব। আর এক শ্রেণির লোক নায়র। নায়ররা আদিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এদেশ জয় করতে এসেছিলেন। নায়রদের বীরত্বের অনেক কাহিনি আছে। কিন্তু এখানে কতকগুলি প্রথা অত্যন্ত বিস্ময়কর। প্রথমত ব্রাহ্মণ বা গুরুজনদের দেখলে নায়র বা শুদ্র স্ত্রীলোকদেরকে বশ অনাবৃত করতে হয়। এই তাদের সম্ভ্রম প্রকাশের চিহ্ন। টিপু সুলতান নাকি উপহাস ছলে একজন নায়র যুবককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘নায়র যুবতীদের বক্ষস্থল অনাবৃত কেন? লোকে ত অপমান করিতে পারে।’ তার উত্তর নায়র যুবক বললেন, 'নায়রদের স্ত্রীগণের বন্ম। অনাবৃত, পুরুষদের তরবারিও অনাবৃত্ত।একদিন অপরাহ্নে একজন ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে ভ্রমণকালে শিবনাথ দেখেন, একজন নিচু শ্রেণির লোক আসতে আসতে দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে গেল এবং কী যেন বলল। কারণ জিজ্ঞেস করায় ব্রাহ্মণ বললেন, ও আমাকে ব্রাহ্মণ বলে জানে, এজন্য দাঁড়িয়ে আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছে যেন ওর বাতাস বা ছায়া আমার গায়ে না লাগে; এই আমাদের সামাজিক প্রথা।

আরও ভয়ঙ্কর সংবাদ হল নায়র এবং শূদ্র বালিকার বিয়ে হয় না। বিয়ের বয়স হলে একটি স্বজাতীয় যুবকের সঙ্গে নাম মাত্র বিয়ে হয়। বিয়ের পরের দিন থেকে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ হয়। তারপর থেকে মেয়ে তার বাবার ঘরেই থাকে। বয়স হলে

আত্মীয়-স্বজন একজন ব্রাহ্মণ যুবককে ডেকে তার সঙ্গে পরিচয় করে দেয়। সেই আসল বর হয়। যদিও সন্তানদের প্রতি তার কোনো দায়িত্ব থাকে না। সে দায়িত্ব মামার বাড়ির। একে ইংরেজিতে repotism বলে। । আবার নাম্বুরী ব্রাহ্মণদের জ্যেষ্ঠ পুত্র বংশ রক্ষার জন্য বিয়ে করেন, অপর পুত্রেরা বিয়ে না করে নায়র বা শূদ্রজাতীয় মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক করে। প্রয়োজনে একাধিক নায়র রমণীর সঙ্গে সম্পর্ক করে। এরকম একজন নায়র ভদ্রলোক শিবনাথকে বলেছিলেন—তার দেহে ব্রাহ্মণের রক্ত। এই সব আশ্চর্য বিষয় অবগত হয়ে, আবার অসুস্থ শরীরে কলকাতায় ফিরেন।সেকালে কলকাতায় ব্রাহ্মধর্ম এমনই গরিমায় উন্নিত হয়েছিল যে, ১৮৯২ সালে ব্রাহ্মী আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৩-এর ১২ মাঘ উৎসবের দিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপাসনা কার্য।

শেষে করে চলে গেলেন। প্রার্থনাদি শেষে আগত বন্ধুগণ দান করতে শুরু করলেন। এমনকি পুরুষেরা গায়ের শাল, দামি পট্টবস্ত্র, মহিলারা বালা, চডি, গলার হার, শিবনাথকে এ হিসেবে দিলেন। তা বিক্রি করে সে যুগে কয়েক শাে টাকা হল। শিবনাথ শত্রা যে কাজে হাত দিয়েছেন, শত অর্থকষ্ট সত্ত্বেও সেই কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন। একমাত্র নারী বাে র্ডিং করতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। এরপর তিনি আবার কয়েক মাস সিমলা, দার্জিলিং, কটক, পুরী যান। প্রথম স্ত্র প্রসন্নময়ীর মৃত্যু হয়েছে। নিজে বহুসূত্র রোগে আক্রান্ত। দ্বিতীয় স্ত্রী বিরাজমোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ভারত ভ্রমণে বের হলেন। আবারও সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে ১৯০৭-এ অন্ধ্র কনফারেন্সে সভাপতির কাজ করে ফিরে এসে বাবা ও নিজে অসুস্থ হন। এই পর্যন্ত তার আত্মচরিত ষাট বছরের কাহিনি ক্রম নিয়ে রচিত।

৭.৫ আত্মচরিত গ্রন্থ অবলম্বনে শিবনাথ শাস্ত্রীর দাদু-দিদিমার পরিচয়

"আত্মচরিত" পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক দলিল।গ্রন্থটি আত্মজীবনী সাহিত্যের নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। পূর্বতন ও সমসাময়িক

যেসব ব্যক্তিবর্গ লেখকমনে প্রভাব বিস্তার করেছিল তাদের পরিচয় দানের পাশাপাশি এই গ্রন্থে দান পেয়েছে সমসাময়িক নানা আন্দোলনের ইতিহাস।

গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে "পূর্বপুরুষগণ' এর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছিল তার দাদু এল দিদিমার কথা। তারা বালক শিবনাথের মনে গভির প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।কলকাতা থেকে ছ ক্রোশ দূরে চাঙ্গারিপোতা গ্রাম ছিল লেখকের মামার বাড়ি। দাদু হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন এর পরিচয় লেখকের কথাতেই বলা যাক- "আমার মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন সুবিজ্ঞ, সংস্কৃত পণ্ডিত ও অধ্যাপক ছিলেন। কলকাতা কাঁসারি পাড়াতে তাহার টোল চতুষ্পাঠী ছিল।" যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' নামক যে জনপ্রিয় পত্রিকা প্রকাশ হত, সেখানে সহযোগী সম্পাদকের কাজ করতেন তিনি। পরবর্তীকালে তানে ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত বাংলা পাঠশালাতে 'পণ্ডিত কর্ম' করতেও দেখা গিয়েছিল। সামান্য কৃপণ এই মানুষটি গ্রাম থেকেই একটি দোতলা পাকা বাড়ি তৈরি করে প্রতিবেশীদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন।

ন-দশ বছর বয়সে তাঁর দাদু মারা গেলে তার চেহারার বিবরণ লেখকের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়নি-'তিনি উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন... গৃহস্থালি বিষয়ে পরিপক্কতা তাহার প্রধান গুণ ছিল।'

ঘরের চাল ডাল অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে থাকলেও যখন চাঙ্গারিপোতা থেকে কলকাতা তিনি হেঁটে যাতায়াত করতেন তখন তাকে মিতব্যায়ি না বলে আর উপায় ছিল না। দাদুর মিতব্যয়িতার গুণ পেয়েছিলেন শিবনাথের মা গোলকমণি দেবি। দাদুর পাশাপাশি দিদিমার স্মৃতিও লেখকের মনে আছে। তার মতো সহনশীল ও উদার প্রকৃতি এবং সত্যবাদী রমণী তিনি নিজের জীবনে খুব কমই দেখেছেন বলে গ্রন্থকার জানিয়েছেন। দাদু কিছুটা কৃপণ প্রকৃতির হলেও গ্রামের দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা কখনো দিদিমার আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হতেন না- "মাতামহী দরিদ্রাকে স্ত্রীলোকদিগকে গোপনে ডাকিয়া সেই চালডাল অঞ্চল ভরিয়া দান করিতেন; টাকাকড়ি সর্বদা দুই হাতে দান করিত। ... মাতামহীর নিজ ব্যয় বলিয়া তাহার হস্তে যাহা দেওয়া

হইত,তাহা হইতেও দান-ধ্যান চলিত।" লেখকও এই দান থেকে বঞ্চিত হননি। কলকাতায় পড়াশোনা করতে এসে কখনো কখনো অর্থাভাব হলে অগতির গতি হয়ে উঠছেন তিনি।– "গোপনে আমার কাপড়ের খুঁটে তাহার নিজের টাকা হইতে হয়তো দুইটি বা চারিটি টাকা বাঁধিয়া দিতেন,বলিতেন, এ কথা কাউকে বোলো না। টাকার কষ্ট হলে আমার কাছে এসো"।

লেখকের দিদিমা ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। তাঁর এই গুণটি আবার বড় মামা দ্বারকানাথ এর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। শেষ জীবনে লেখকে মামীরা সংসার থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দেওয়ার পর "তখন ধর্মচিন্তা, দরিদ্র সেবা,গৃহস্থ শিশুগণের পালন তাঁহার প্রধান কাজ দাঁড়াইল।"প্রত্যেকদিন সকালে তিনি রাস্তা হেঁটে যেতেন এবং দরিদ্র পরিবারগুলির খবরা খবর নিতেন। একবার লেখক এর সঙ্গী এক পথচারীকে নিজের মুখের ভাত তুলে দিয়ে তিনি যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, আজকালকার দিনে তা প্রায় বিরল। তাইতো দিদিমা সম্পর্কে লেখকের এর মূল্যায়ন- "বলিতে কি, তাঁহাকে আমি যখন স্মরণ করি আমার হৃদয় পবিত্র ও উন্নত হয় এবং একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে আমাদের যে কিছু ভালো আছে তাহার অনেক অংশক তাঁহাকে দেখিয়া পাইয়াছি।"

৭.৬ আত্মচরিত গ্রন্থ লেখক এর প্রপিতামহের ধর্ম ভাব

গ্রন্থকার শিবনাথ শাস্ত্রী আত্মজীবনী জাতীয় গ্রন্থ 'আত্মচরিত' এর একজন উল্লেখযোগ্য চরিত্র তার প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়লঙ্কার। ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান শিবনাথ ভট্টাচার্য উপবীত ত্যাগ করে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করলেও ছোটবেলায় তার প্রপিতামহের স্মৃতি কখনো ভুলতে পারেননি। তাই 'আত্মচরিত' লিখতে বসে অবলীলাক্রমে তিনি তুলে ধরেছেন পিতামহের জীবনের নানাদিক।বিশেষ করে ধর্মভাবের দিকটি।

১০৩ বছর জীবিত থাকা প্রপিতামহকে শিবনাথ দেখেছিলেন তার ১০-১২ বছরবয়স পর্যন্ত। পণ্ডিত মানুষ ছিলেন তিনি, স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ, কিন্তু ধর্মভাবের দিক

থেকে তাঁর জুড়ি মেলা ভার—"আমার মা তাঁহার ধর্মভাব ও সাধননিষ্ঠা দেখিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে কুলগুরুর নিকট মন্ত্রশীক্ষার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তাহারই নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন।" তাঁদের বাড়ি দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে, ঠাকুরঘর লাগোয়া ছোট পাকা ঘরে থাকতেন প্রপিতামহ। পাথরের বড়ো শিব, কাঠের তৈরি পঞ্চানন মূর্তি, বাললিঙ্গ শিব এবং শালগ্রাম শিলার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করা মানুষটির একমাত্র ভয় ছিল স্নানে—"স্নানের প্রতি প্রপিতামহ মহাশয়ের বড় ভয় ছিল, এজন্য মাসে দুই-চারিবার মাত্র স্নান করানো হইত।" তিনি নিজে শাক্ত মতে বিশ্বাসী ছিলেন। নিজের ইষ্টদেবতাকে "দয়াময়ী মা" বলে ডাকতেন। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি এতটাই ছিল যে, নিজের কন্যাদের নাম তিনি 'দয়াময়ী' ও 'করুণাময়ী' রেখেছিলেন। যদিও দুজনেই ছোটোবেলায় মৃত্যুবরণ করেন। বহুবছর পর লেখকের বোন 'উন্মাদিনী'র জন্ম হলে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন 'দয়াময়ী আবার আসিয়াছে।'

প্রতিদিন তাকে প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবৎ পূজা-আহ্নিক-জপ-তপ-আরতি-পিতৃপুরুষের তর্পণ প্রভৃতি কাজে নিমগ্ন থাকতে দেখা যেত। প্রতিদিন পুজোর পর মাটিতে মাথা ঠুকে প্রণাম করতে করতে তার কপালের ওপর মাংসপিণ্ড জমে ছিল। লেখককে তিনি বাবা সম্বোধন করে ডাকতেন এবং তার সাথে সমবয়স্ক বালকের মতো করে "দুর্গা দুর্গা বল ভাই,/দুর্গা বই আর গতি নাই" গান করতেন ও নাচতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি লেখক কোলে নিয়ে মুখে মুখে বিভিন্ন ধর্মোপদেশ, দেবদেবীর স্তব প্রভৃতি শেখাতেন, যার একটি লেখকের আজীবন স্মরণে ছিল—"সর্বমঙ্গল মজাল্যে শিবে, সর্বার্থসাধিকে/শরণ্যে, এ্যম্বকে, গৌরি, নারায়ণি-নমোহস্তুতে"। আর একটি বিষয় ও লেখক কখনো ভুলতে পারেননি, তা হল প্রপিতামহের জাত্যাহংকার। নিজেদের ব্রাহ্মণ বংশের প্রাচীনতা নির্ধারণের জন্য প্রপিতামহ লেখককে শেখাতেন—"যাবমেরৌ স্থিতা দেবা, যাবদ গঙ্গা মহীতলে,/চন্দ্রাকৌ গানে যাবৎ তাবদ্বিপ্রকুলে বয়ম্।" অর্থাৎ দেবগণ যতদিন মেরুতে আছেন, গঙ্গা যতদিন পৃথিবীতে আছেন, চন্দ্র-সূর্য যতদিন আকাশে আছেন ততদিন আমরা ব্রাহ্মণকুলে আছি। যদিও ছোটো বেলায় প্রপিতামহের সেই সব ধর্মীয় শিক্ষার কোনোটাই লেখক বহন করতে পারেননি। ব্রাহ্মণকুল উপবীত ত্যাগ করে

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত লেখক বাকি জীবনটা অতিবাহিত করেন। প্রপিতামহের কথা স্মরণ করার সময় হয়ত বা আক্ষেপও জন্মায় নিজ কর্মের জন্য "এখন ভাবি, তিনি কি ভাবিয়াছিলেন, আর আমি কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।" কিংবা "হায় রে, তিনি তাঁর ইষ্টদেবতাকে যেমন অকপটে 'মা' বলিতেন আমি কেন তেমন করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে পারিনা।" আসলে মানুষ যখন জীবনপথে এগিয়ে চলে, কর্তব্য বা ভালোলাগার ক্ষেত্র থেকে নতুন পথের শরিক হয় তখন সাময়িক ভাবে শিকড় ত্যাগ করে এলেও মনের গভীর অন্য কোণে তার বীজ থেকেই যায়। ভবিষ্যতে যখন দীর্ঘপথে পাড়ি দিয়ে সে ক্লান্ত অনুভব করে তখন শিকড়ের টানে মাটির কাছে ফিরতে চাইলেও অনেক সময় ফেরা হয় না। কিছু স্মৃতি রয়ে যায় মনের মধ্যে। শিবনাথ শাস্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রপিতামহের ধর্মশিক্ষার আলোচনায় তেমনই কিছু ঘটেছিল বলেই মনে হয়।

৭.৭ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ এবং ব্রাহ্মচেতনা বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর ভূমিকা

ব্রাহ্মধর্ম এবং আন্দোলনের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের সঙ্গে যে নামটি বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়, তিনি শিবনাথ ভটাচার্য। কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান সংস্কারের বাধা কাটিয়ে, প্রপিতামহের ধর্মশিক্ষা ভুলে, পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ব্রাহ্মসমাজের একজন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"তমসো মা জ্যোতির্গময় - এই প্রার্থনাটি তিনি শাস্ত্র হইতে পান নাই, বুদ্ধিবিচার হইতে পান নাই, ইহা তাহার জীবনীশক্তিরই কেন্দ্র নিহিত ছিল, এই জন্য তাহার সমস্ত জীবনের বিকাশই এই প্রার্থনার ব্যাখ্যা।"

ছোটোবেলায় গ্রামে থাকার সময়ই ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে শুনেছিলেন লেখক। গ্রামের শিবকৃষ্ণ দত্ত প্রথম ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে গ্রামের উৎসাহ দান করেছিলেন। কলকাতায় আসার পর ভবানীপুরের মহেশচন্দ্র চৌধুরীর বাসায় লেখকের থাকার সময় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্তি কিছুটা বৃদ্ধি হয়। ব্রাহ্মসমাজের বাড়ি এই বাসার কাছাকাছি হওয়ায় এবং কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য কানে শোনার পর থেকেই ব্রাহ্ম

সমাজের দিকে মনে মনে একটু আকর্ষণ হয়। গ্রামের শিবকৃষ্ণ দত্ত, কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু, রমানাথ ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্রাহ্মনুরাগীদের আন্দোলন এবং নির্যাতন লেখক মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সময় ব্রাহ্মদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন। লেখকের ব্রাহ্মণপিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য। বাড়ির সকলের সামনে বাবার মুখে ব্রাহ্মদের প্রশংসাই—"আমার ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইবার অন্যতম কারণ।" আর একটি পারিবারিক সমস্যাও তরুণ শিবনাথের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা হল দ্বিতীয় বিবাহ। পিতার জোরাজুরিতে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ করার পর তাঁর মনে—"দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। আমি আমুদে উপহাস রসিক বন্ধুতপ্রিয় মানুষ ছিলাম, আমার হাস্য পরিহাস কোথায় উবিয়া গেল। আমি ঘন বিষাদে নিমগ্ন হইলাম।" এই অবস্থা থেকে তিনি উদ্ধার পান উমেশচন্দ্র দত্তের দেওয়া থিওডোর পার্কারের "টেন সারমনস অ্যান্ড প্রেয়ার্সগ্রন্থের প্রার্থনাগুলি " ঘোরনাথ গুপ্ত অ ,বিজয়কৃয় গোস্বামী ,যোগেন্দ্র ,পাঠ করে। এরপর ব্রাহ্মবন্ধু উমেশ প্রমুখের সক কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার মনস্থ করলেন—"১৮৬৮ সালের শেষ পর্যন্ত আমার হৃদয়ে ব্যাকুলতা অগ্নির মতো জ্বালিতেছিল। আমার অনেক পুরাতন কুৎসিত অভ্যাস ত্যাগ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম।" কেশব চন্দ্র সেনের নগরকির্তন "তোরা আয়রে ভাই এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,/নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম" শুনে লেখকের প্রতিক্রিয়া "এই আহবান ধ্বনি আমার প্রাণে বাজিল আমার যেন মনে হইল, আমাকে ডাকিতেছে। ইহাতে ব্রাহ্মধর্মের যে আদর্শ আমার নিকট ধরিল। তাহাতে আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল।" এই মুগ্ধতা থেকে ১৮৬৯ খ্রি, ২২ আগস্ট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে ২১ জন ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে দীক্ষা নিলেন শিবনাথ।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণের পর তার পারিবারিক জীবনেও বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। যে পিতা একসময় গ্রামে ব্রাহ্ম নির্যাতনের প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি পুত্রের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ মেনে নিতে না পেরে তাকে পরিত্যাগ করেন। গ্রাম ছেড়ে, সংস্কার ছেড়ে, উপবীত ছেড়ে কলকাতা এসে নতুন সংগ্রামের জীবন শুরু হয় তার। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে

কিছুদিন মতামত আদানপ্রদান ঠিকমতো চলতে থাকলেও একসময় কুচবিহারের রাজপরিবারে নিজের অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহদাণকেন্দ্রে করে ব্রাহ্মসমাজের মতবিরোধ প্রকাশ্যে এসে যায়। কেশবাবুর পক্ষে বিপক্ষে মতামত, আলোচনা এমনকি পত্রপত্রিকাতে প্রকাশ্যে মতপার্থক্য সকলের নজরে আসে। ফলত কেশবচন্দ্রের সঙ্গে চিন্তাশীল ব্রাহ্মযুবকদের বিচ্ছেদ ঘটে এবং শিবনাথ শাস্ত্রী আনন্দ মোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের উদ্যোগে গড়ে ওঠে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (১৫ মে, ১৮৭৮)। এখানে স্বতন্ত্র উপাসনা হয়, নতুন মন্দির তৈরি হয় এবং লেখক স্বয়ং সমগ্র ভারতবর্ষ এমনকি ইংলন্ডেও ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মতপার্থক্যের জন্য সাধারণের কাছে নিজেদের অবস্থান হীনতার জন্য কিছুটা আক্ষেপ শোনা যায় তার কণ্ঠে—"এরূপ দলাদলির মাথায় ধর্ম টেকে না। আমরা সেই যে ধর্ম হারাইয়াছি, তাহার সাজা এতদিন ভোগ করিতেছি, আর কতদিন ভোগ করিব, ভগবান জানেন। ব্রাহ্মসমাজ এতদ্বারা লোক সমাজে যে হীন হইয়াছে, তাহা আজিও সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ব্রাহ্ম সমাজের অধঃপতন আমাদের পাপের শাস্তি।" শেষপর্যন্ত তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক রূপে ব্রাহ্মমাজের উন্নতিকল্পে নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, কর্তব্যপালনে দৃঢ়তা, চরিত্রে সংযম, মানবে প্রীতি আর ঈশ্বরে ভুক্তি নিয়েই শিবনাথের জীবন।

৭.৮ শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত 'আত্মচরিত' গ্রন্থটি আত্মজীবনী সাহিত্যরূপ কতখানি সার্থক

গদ্যসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শখা হল জীবনীসাহিত্য বা জীবনচরিত (Biography)।প্রবন্ধ, রম্যরচনা, সমালোচনা সাহিত্যের মতো এটিও গদ্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য শাখা। সাধারণভাবে জীবনীসাহিত্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনের লিপিবদ্ধ বিবরণ। একজন লেখকের কলমে জনপ্রিয় কোনো ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত বিশ্লেষিত হয় এই ধরনের গ্রন্থে। জন ডাইড্রেনের মতে জীবনীসাহিত্য—"The history

of particular men's lives."। জীবনীসাহিত্যের একটি শাখা আত্মজীবনী বা আত্মচরিত (Auto biography) যেখানে লেখক স্বয়ং নিজের জীবনবৃত্তান্তকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। M. H. Abrams বলেছেন "Autobiography is a biography written by the subject about himself or herself." প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে এই জাতীয় বহু গ্রন্থই রচিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় লিখিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' জীবনীসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। শিক্ষক, সমাজকর্মী এবং প্রচারক তুলে বিভিন্ন সময় নানা মানুষ এবং ঘটনা প্রত্যক্ষ করে যে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তিনি গড়ে তুলেছিলেন, সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে তার প্রভাব অনিবার্যভাবে এসেছে। কবিতা, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য এবং পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি ছিলেন সিধহস্ত। তার দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'আত্মচরিত' আজ বাঙালি সংস্কৃতির আবশ্যিক অঙ্গণ। কী নেই গ্রন্থ দুটিতে। বিশেষ করে "আত্মচরিত"। ব্যক্তি, পরিবার ,প্রেম , ব্রাহ্মসমাজ সবকিছুর পরিচয়ে সমৃদ্ধ এই ,সাহিত্যসৃষ্টি ,দেশপ্রেম ,রাজনীতি ,ধর্ম ,সমাজ কোনো ব্যক্তিজীবন যখন না" গ্রন্থ। অধ্যাপক বারিদবরণ ঘোষের মতেনা মহৎকর্মের মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর দেশকালের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সেই ব্যক্তি জীবন হয়ে দাঁড়ায় সমগ্র জাতির সম্পদ ও পূর্বাপর ইতিহাসের বিষয়বস্তু। দেশকালের মধ্যে বিধৃত একটি জাতির ইতিহাস লেখা যেমন সহজ নয়, তেমনি জাতির সম্পদ যে বড় মানুষ তার জীবনী লেখাও সহজ নয়। কিন্তু সেই কঠিন কাজটি শিবনাথ সহজেই আয়ত্ত করেছিলেন।"

আত্মচরিত রচনার ব্যাপারে প্রথম থেকেই শিবনাথের আপত্তি ছিল। তার জ্যেষ্ঠা কন্যা তথা "শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত" রচয়িতা হেমলতা দেবী যখন পিতার জীবন চরিত রচনার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন শিবনাথ নিজেই আপত্তি জানিয়েছিলেন। হেমলতা দেবীকে পত্রে তিনি লিখেছিলেন—"ছিঃ ছিঃ এমন কাজ করিও না। ...আমার আবার জীবনচরিত লেখা হইবে ভাবিলেও আমার লজ্জা হয়।" অবশ্য শিবনাথের মৃত্যুর পর হেমলতা দেবী পুর্বোক্ত গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন এবং তার অনেক আগেই মৃত্যুর

বছরখানেক আগে শিবনাথ নিজেই রচনা করেছিলেন “আত্মচরিত”। একসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ‘আত্মচরিতপ্রকাশের জন্য। সেসময়ও ’ তিনি একইভাবে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অবশেষে লাবণ্যপ্রভা বসুর প্রত্যক্ষ ও নিরন্তর তাগিদে নিজের জীবনচরিত লেখা শুরু করেন শিবনাথ পঞ্চান্ন বছর বয়সে এবং গ্রন্থটি রচনা শেষ হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। যদিও দশবছর পর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে এটি গ্রন্থাগারে মুদ্রিত হয়। এর আগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আত্মজীবনী' (১৮৯৮খ্রি.), দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের "আত্মজীবনী” (১৯০৪খ্রি.), রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (১৯০৯খ্রি.) গ্রন্থগুলি বাঙালি পেয়েছে। কিন্তু ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রীর অকপট স্বীকারোক্তিসহ প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থ “আত্মচরিত” যেন এক অন্য মাত্রা দান করলো- “আত্মচরিত রচনার মূল প্রেরণা হল আত্মোপলব্ধি। সেই আত্মোপলব্ধিকে প্রমূর্ত করতে প্রয়োজন হয় নানা উপকরণের। এই আত্মজীবনী রচনার প্রথম শর্ত হল তথ্যনিষ্ঠা—এ শিবনাথ আদ্যন্ত পালন করে গেছেন” (বারিদবরণ ঘোষ)। চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপলব্ধির পার্থক্য ধরা পড়ে বিভিন্ন জীবনী সাহিত্যে। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনীটিও তেমনি পূর্ববর্তী প্রকাশিত জীবনী সাহিত্যগুলির থেকে আলাদা। গ্রন্থে উল্লিখিত তার পরিবারবর্গ, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিত “শুদের চিত্র যেভাবে অকিত হয়েছে, তা অনবদ্য। উপন্যাসের মতো আত্মজীবনীটি বক্তব্য বিন্যাসের পরিচ্ছন্নতায়, সহজ কৌতুকবোধ, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বর্ণনায়, তার অকপটতায়, বর্ণনার কালানুক্রমিকতায় এবং সংলাপধর্মিতায় সমগ্র আত্মচরিতটি হৃদ্য হয়ে উঠেছে।” আত্মজীবনী সাহিত্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন, 'তথ্যপূর্ণ ব্যক্তি জীবনের ইতিহাস, সাহিত্যরসে জারিত ব্যক্তিজীবনের কথা, তথ্যবিকৃতি না ঘটানো, গ্রন্থাকারকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং “Perfect pattern of well told life”-কে তুলে ধরা প্রভৃতিও শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘আত্মচরিত’ এ লক্ষ্য করা গেছে। তাই এটিকে সার্থক জীবনচরিত রূপে মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকার থাই নেই।

৭.৯ ইংল্যান্ড যাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছিলেন তার পরিচয়

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক রূপে শিবনাথ শাস্ত্রী ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল পরিভ্রমণের পাশাপাশি ইংলন্ডেও নিয়েছিলেন ইংরাজি ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তার বিলাত যাবার ইচ্ছা প্রবল ছিল—"ব্রাহ্ম মিশনারীর ও মিশনের কার্য সমুচিতরূপে করিতে।" অবশেষে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ বন্দু দুর্গামোহন দাস এবং ডেপুটি কালেক্টর বাবু পার্বতীচরণ রায়ের সঙ্গে তিনি জাহাজে করে ইংলন্ড রওনা দিয়েছিলেন। ইংলন্ডে গিয়ে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি হল সেখানকার শিক্ষাব্যাবস্থা। ইংলন্ডের সাকুলেটিং লাইব্রেরী, শিশুরক্ষিণী-সভা, শ্রমজীবীদের শিক্ষালয়, ডাক্তার বাণার্ডো ও জর্জ মুলালের অনাথ আশ্রম, কিন্ডার গার্ডেন স্কুল, বোর্ড স্কুল, লন্ডনের বিট্রিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সচক্ষে দেখে তিনি সমৃদ্ধ হন এবং ভারতে ফিরে তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। কিন্ডার গার্ডেন স্কুল দেখার পর তার মনে শুনেছিল—"শিশুদিকে হাতে কলমে শিক্ষা দিবার যে এত প্রকার উপায় উদ্ভাবন হইতে পারে, তাহা অগ্রে জানিতান না। শিশুদের এই শিক্ষা প্রণালী আমার এত ভালো লাগিয়াছিল যে, আমি আসিবার সময় কিন্ডারগার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রোবেলের জীবনচরিত ও উষ্ণ শিক্ষাপ্রণালীর কয়েকখানি গ্রন্থ কিনিয়া আনিলমি।" অন্যদিকে মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলে এসে তিনি লক্ষ্য করেন—"কী শৃঙ্খলা, কী পরিষ্কার পল্লিছন্নতা। কী পাঠ ক্রীড়া প্রভৃতির সুনিয়াম। যাহা দেখি, তাহাতেই চমৎকৃত হইতে হয়।" ইংল্যান্ডে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে গ্রন্থাগারের চাহিদা প্রবল। তাদের গ্রন্থ প্রেম সম্পর্কে লেখক লিখেছেন 'পথ ঘাট গলি ঘুচি সর্বত্রই পুস্তকালয়। সামান্য ব্যয়ে সকল শ্রেণির মানুষ পড়িবার সুবিধা পায়। ইহাতেই প্রমাণ ইংরেজদের জ্ঞানস্পৃহা কত প্রবল।' লেখক ইংল্যান্ড ভ্রমণকালে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের উন্নতির জন্য নানা প্রচেষ্টা চলছিল, তার মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের নানা উপায় শিবনাথকে চমৎকৃত করছিল। পরবর্তীকালে তিনি এই অভিজ্ঞতার ভান্ডার উজার করে ভারতীয় নারীদের শিক্ষিত করার মানসে স্থাপন করেন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়—"ইংলন্ড

হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি যে কয়েকটি কার্যের সূত্রপাত করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একটি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় স্থাপন। আগেই বলিয়াছি যে, আমি ইংলন্ডে বাসকালে কিন্ডারগার্ডেন স্কুল দেখিয়াছিলাম, এবং শিক্ষা বিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থও কিনিয়া আনিয়াছিলাম। সেইগুলি পাঠ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি নুতন চিন্তা আমার মনে উদয় হয়। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় স্থাপন তাহারই ফল।" শুধু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনই নয়, শিশুদের গল্পচ্ছলে শিক্ষাদানের ব্যাপারেও ইংলন্ডের স্কুলগুলিতে দেখা কৌশল তিনি প্রয়োগ করেছিলেন গ্রামের বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণিতে। পরবর্তীকালে হরিনাভি এবং ভবানীপুরের বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক থাকার সময় তিনি –"নিম্নশ্রেণির মাস্টারদিগকে ছেলেদিগকে ভুলাইয়া পড়াইবার উপদেশ দিয়াছি। ইংলন্ডে গিয়া কিন্ডারগার্ডেন স্কুল দেখিয়া ঐ-সকল ভাব আমার মনে আরও প্রবল হয়।"

এইভাবে ইংলন্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাদানের কৌশলকে কাজে লাগিয়ে তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতি করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেলেও শিশুদের গল্পচ্ছলে শিক্ষাদানে, ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষাদানে বা চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানে কিন্ডার গার্ডেন মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে। সেকথা মনে রাখলে প্রায় দেড় শতাধিক বছর আগে শিক্ষাচিন্তা নিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর ভূমিকাকে সম্মান জানাতেই হয়।

৭.১০ সংক্ষিপ্ত ও অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রঃ আত্মচরিত গ্রন্থটি কার লেখা?

উঃ "আত্মরিত" গ্রন্থাটি শিবনাথ শাস্ত্রীর (ভট্টাচার্য) লেখা।

প্রঃ শিবনাথ শাস্ত্রী কোন্ সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত, বর্তমান ছিলেন ?

উঃ শিবনাথ শাস্ত্রী ইংরাজি ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।

প্রঃ আত্মচরিত গ্রন্থটি (সিগনেট সংস্করণ অনুযায়ী) কতগুলি পরিচ্ছেদে বিভক্ত?

উঃ "পরিশিষ্ট অংশসহ গ্রন্থটি তেইশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

প্রঃ আত্মচরিত গ্রন্থটি প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

উঃ আত্মচরিত গ্রন্থটি ১৯১৮ খ্রি: প্রবাসী কার্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

প্রঃ আত্মচরিত গ্রন্থের অন্য কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কী?

উঃ ১৯৮২ খ্রি: গৌতম নিয়োগীর সুসম্পাদনায় আত্মচরিত গ্রন্থটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রঃ গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশটি কী লেখকের নিজের সংযোজন ?

উঃ গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর 'প্রবাসী' থেকে 'আত্মচরিত' যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয় (১৯২০ খ্রি:) সেখানে অতীশচন্দ্র চক্রবর্তী পরিশিষ্ট অংশটি সম্পাদনা ও সংযোজিত করেন।

প্রঃ আত্মচরিত কোথায় বসে লিখিত হয়েছিল৯?

উঃ শিবনাথ শাস্ত্রী কোলকাতায় ভবানীপুরের ৪১ নং পদ্মপুকুর রোডের বাড়িতে বসে আত্মচরিত রচনা শুরু করেছিলেন (২৬মে, ১৯০২খ্রি:)। গ্রন্থটি শেষ হয়েছিল দার্জিলিং-এ (৫ জুন ১৯০৮)।

প্রঃ আত্মচরিত গ্রন্থটিকে 'যুগান্তর' উপন্যাসের পরিপূরক বলে কে মনে করেছিলেন?

উঃ সুসাহিত্যিক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" উপন্যাসটির পুন: প্রকাশকালে গ্রন্থদুটিকে পরস্পরের "পরিপূরক" বলে উল্লেখ করেছিলেন।

প্রঃ গ্রন্থের দ্বিতীয় 'পরিশিষ্ট' অংশে কোন্ ব্যক্তিদের পরিচয় লিপি?

উঃ গ্রন্থে উল্লিখিত বিদেশী ব্যক্তিদের "পরিচয়"-এর কথা আছে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট অংশে।

প্রঃ গ্রন্থের তৃতীয় পরিশিষ্ট অংশটি কী সূচক?

উঃ গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক নামসুচী-র পরিচয় আছে তৃতীয় পরিশিষ্ট অংশে।

প্রঃ শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মস্থান কোথায়?

উঃ কলকাতা থেকে তিরিশ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সুন্দরবনের উত্তর দিকে এবং জয়নগর গ্রামের পুর্বদিকে অবস্থিত মজিলপুর গ্রামে শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম হয়।

প্রঃ মজিলপুর গ্রামে কোন কোন জাতির বসবাস ছিল বলে লেখক উল্লেখ করেছেন?

উঃ প্রসিদ্ধ মজিলপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ,কায়স্থ ছাড়াও কামার,কুমর,ধোপা,নাপিত,হাড়ি,মুচি জাতির বসবাসের কথা জানা যায়।

প্রঃ 'ময়দা' কী?

উঃ 'ময়দা' একটি গ্রামের নাম। সেটি মজিলপুরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। প্রাচীন বাংলা কাব্যে ও পোর্তুগিজদের বিবরণেও এই গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

প্রঃ গ্রন্থাকারের পূর্বপুরুষ কে ছিলেন? তিনি কার সাথে কোথা থেকে এদেশে এসেছিলেন?

উঃ প্রকারের পূর্বপুরুষ ছিলেন চন্দ্রকেতু দত্ত নামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্রলোকের যজ্ঞপুরোহিত এ কুলগুরু শ্রী কৃষ্ণের উদ্গাতা।

তিনি চন্দ্রকেতু দত্তের সঙ্গে যশোর জেলা থেকে এদেশে এসেছিলেন কীনা তার সঠিক বিবরণ জানা যায়নি। তবে তিনি দক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণ বলে খ্যাত।

প্রঃ লখকের পূর্বপুরুষদের উদগাতা উপাধিটি কোন সম্পর্ককে সূচিত করে?

উঃ লেখক এর পূর্বপুরুষগণ বাৎস্য গোত্র অধিকারী ছিলেন।

প্রঃ লেখক এর পিতার নাম কি? তিনি কোন কর্মে রত ছিলেন?

উঃ লেখক এর পিতার নাম হরানন্দ ভট্টাচার্য। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয় এর বহু আগেই ইংরেজ সরকারের চাকরি নিয়ে দেশের মানুষের কয়েকজনের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

প্রঃ লেখকের এর প্রপিতামহ ও মাতামহর নাম কি ছিল? প্রপিতামহ পেশায় কি ছিলেন?

উঃ লেখকের প্রপিতামহ ছিলেন রামজয় ন্যায়ালঙ্কার। মাতামহ ছিলেন রামকুমার ভট্টাচার্য। প্রপিতামহ অধ্যাপক ছিলেন ও পৌরোহিত্য করতেন।

প্রঃ লেখকের পিতামহির নাম কি ছিল? তিনি কোন বংশের কন্যা ছিলেন?

উঃ লেখকের পিতামহির নাম ছিল লক্ষীদেবী। তিনি মজিলপুর গ্রমের কাবায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ঘরের কন্যা ছিলেন।

প্রঃ লেখকের পিতামহির সাহসিকতার পরিচয় দাও।

উঃ লেখকের পিতামহি একবার একটা চোর ধরেছিলেন।একবার জ্বলন্ত কাঠ হাতে বাঘ তাড়া করেছিলেন এবং তাকে বাড়ির বাইরে বের করে দিয়েছিল।

প্রঃ কোন ঘটনার কারণে লেখকের ঠাকুরদা ঠাকুরমা মারা যান?

উঃ ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন হয় এবং তারপরে বাংলাদেশে ওলাওঠা রোগ দেখা যায়। এই রোগের কারনে লেখকের আত্মীয়রা মারা যান।

প্রঃ ঠাকুর দাদার মৃত্যুর সময় বড় পিসির বয়স কত ছিল? সে সময় লেখকের পিতার বয়স কত ছিল?

উঃ ঠাকুরদাদার মৃত্যুর সময় বড়পিসির বয়স ছিল ষোল সতের বছর। সে সময় লেখকের এর পিতা ছয় সাত বছরের ছিলেন।

প্রঃ লেখক কুলীন বিবাহের বিষয়ে কার বিবাহের উদাহরণ দিয়েছেন?

উঃ লেখক কুলীন বিবাহের বিষয়ে নিজের পিতা-মাতার বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন। ১০ ১১ বছর বয়সে তার পিতার বিবাহ হয়েছিল।

প্রঃ চাঙ্গারিপোতা গ্রামের দিক নির্দেশ কর।

উঃ লেখকের মামার বাড়ি কলকাতা শহর থেকে ছ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল।

প্রঃ রাজপুর থেকে কুঠিওয়ালা বাবুরা কিসে করে কলকাতায় আসতেন?

উঃ রাজপুর থেকে দোলদার ছক্কা গাড়ি চড়ে কুঠিওয়ালা বাবুরা কলকাতায় আসতেন।

প্রঃ লেখক এর জন্ম তারিখ ও সময় উল্লেখ করো।

উঃ বাংলা ১২৫৩ সালের ১৯শে মাঘ (ইং ১৮৪৭ সালের ৩১শে জানুয়ারি) রবিবার প্রতিপদ তিথিতে সন্ধ্যাবেলায় লেখক এর জন্ম হয়।

প্রঃ লেখক এর জন্মের সময় তার পিতা কি করতেন?

উঃ লেখোকের জন্মের সময় তার পিতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন।

প্রঃ লখকের বাবা কলেজে কাদের প্রিয় পাত্র ছিলেন?

উঃ লেখোকের বাবা সংস্কৃত কলেজে ছাত্রাবস্থায় ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রিয় পাত্র ছিলেন।

প্রঃ ছেলেবেলায় লেখক পাঠশালা থেকে কোন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন?

উঃ ছেলেবেলায় লেখককে পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে তার মা গ্রামের হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলে ভর্তি করেছিলেন।

প্রঃ লেখকের বাড়িতে ছেলেবেলায় কোন কোন বিগ্রহের কথা শোনা যায়?

উঃ লেখকদের বাড়িতে শালগ্রাম শিলা, শিব ঠাকুর রবি ঠাকুর দেবতার কথা শোনা যায়।

প্রঃ ছেলেবেলায় লেখক এর কোন খাবারের প্রতি অরুচি ছিল?

উঃ ছেলেবেলায় লেখকের ঠাকুরের জন্যে নিবেদিত অন্নভোগ এর প্রতি অরুচি ছিল।

প্রঃ উন্মাদিনী কে ছিল? তার এরকম নামকরন কে করেছিলেন?

উঃ উন্মাদিনী ছিলেন লেখক এর ভগিনী। লেখকের এর পিতা তার কন্যার এরূপ নামকরণ করেছিলেন। সে দেখতে অত্যন্ত সুন্দরী হওয়ায় পিতা এরকম নামকরণ করেছিলেন।

প্রঃ বড় পিসির পরিচারিকার নাম কি? লেখকেরা তাকে কি নামে ডাকতেন?

উঃ বড় পিসির পরিচারিকা ছিলেন চিন্তাদাসী। লেখকরা তাকে চিন্তা দিদি বলে ডাকতেন।

প্রঃ হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলটি কোন মাধ্যমের ছিল? সেখানকার প্রথম পণ্ডিত কে ছিলেন? লেখক সেখানে কোন কোন বই পড়তেন?

উঃ হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলটি বাংলা মাধ্যমের ছিল।সেখানে প্রথম পন্ডিত ছিলেন কাঁচরাপাড়া নিবাসী শ্যামাচরণ গুপ্ত। লেখকরা এখানে স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত বর্ণমালা, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশু শিক্ষা, বর্ণপরিচয় বই পড়তেন।

প্রঃ গ্রামে কার উদ্যোগে ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল? প্রধান শিক্ষক কে ছিলেন?

উঃ গ্রামে হরিদাস দত্তের উদ্যোগে ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এই স্কুলটি একজন ইংরেজ হেডমাস্টার চালাতেন।

প্রঃ ‘মজিলপুর পত্রিকা’ কাদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়?

উঃ গ্রামের জমিদার বাড়ির ছেলে হরিদাস দত্ত ও কয়েকজন যুবকের উদ্যোগে ‘মজিলপুর পত্রিকা’ প্রকাশিত হয়।

প্রঃ মজিলপুর গ্রামে কার উৎসাহে ব্রহ্মধর্ম প্রবেশ করে? তিনি কোন গ্রন্থের অনুবাদক?

উঃ শিবকৃষ্ণ দত্তের উদ্যোগে মজিলপুর গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম প্রবেশ করে। তিনি ‘লুক্রিসিয়ার উপাখ্যান’ কে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

প্রঃ কোন কারণে কাকে ‘আফিম খেকো বামন’ বলে ডাকা হতো?

উঃ ছেলেবেলায় লেখকের ভুঁড়িটি বেশ বড় ও গোলগাল হওয়ার শ্যামাচরণ পন্ডিত মশাই তাকে 'আফিম খেকো বামন' বলে ডাকতেন।

প্রঃ লেখক এর প্রথম শিক্ষকতা কোথায়? সেখানে তিনি কোন ছন্দে নাচতেন?

উঃ লেখক এর প্রথম শিক্ষকতা এক বিধবা ঠাকুরমাকে বর্ণপরিচয় শেখানোর মাধ্যমে। তিনি সেখানে মিষ্টি খেয়ে 'শিব নাচি নাচি যায়,শিব ডমরু বাজায়,ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডম্বুরু বাজায়' কথার ছন্দে নাচতেন।

প্রঃ 'অবলা বান্ধব' এ কার কোন কবিতা কে ছাপিয়েছিলেন?

উঃ 'অবলা বান্ধব' পত্রিকায় গ্রন্থাকারের লেখা 'তুমি কি আমার সেই খেলার সঙ্গিনী' কবিতাটি তার বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছাপিয়েছিলেন।

প্রঃ ছেলেবেলায় লেখক কোন কোন পশু পাখি পুষেছিলেন?

উঃ লেখক টুনটুনি বুলবুলি দয়েল,ছাতার,শালিক,টিয়া, পিঁপড়ে , বিড়াল পুষেছিলন।

প্রঃ লেখক কত সালে কোন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন? সেখানকার কর্তা কে ছিলেন?

উঃ লেখক ১৮৫৬ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে কর্তা ছিলেন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

প্রঃ সংস্কৃত কলেজে লেখকেরা কোন গ্রন্থ অনুসারে সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করেছিলেন? সেখানে আগে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কোন গ্রন্থ পড়ানো হতো?

উঃ সংস্কৃত কলেজে এসে লেখকরা বিদ্যাসাগর প্রণীত উপক্রমণিকা থেকে সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করেছিলেন। আগে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ানো হতো।

৭.১১ অনুশীলনী

১। আত্মজীবনী কি আলোচনা কর।

২। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

মন্তব্য

৩। আত্মচরিত গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রীর দাদু দিদিমার পরিচয় কিভাবে ফুটে উঠেছে?

৪। শিবনাথ শাস্ত্রী তার প্রপিতামহ সম্পর্কে কি বলেছেন?

৫। শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ ও ব্রাহ্ম চেতনা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৬। আত্মচরিত গ্রন্থটি কতখানি আত্মজীবনী হয়ে উঠেছে যুক্তি সহকারে বর্ণনা করো।

৭। আত্মচরিত গ্রন্থটি শিক্ষাক্ষেত্রে কি পরিবর্তন এনেছিল?

৭.১২ গন্থপঞ্জি

জীবনী সাহিত্য –বিচার বিশ্লেষণ, শীতল চৌধুরী